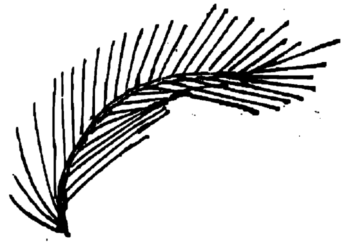


নীল রাত্রি

নীল রাত্রি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

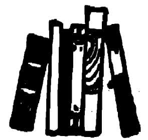
প্রথম সংস্করণ :
৭ই শ্রাবণ,
১৮৮০ শকাব্দ

তিন টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩



উৎসর্গ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

বন্ধুবরেষু



এই উপন্যাসের সব ক'টি চরিত্র, ঘটনা এবং ঘটনাস্থল কাল্পনিক।

উপন্যাসটি 'চতুরঙ্গ' ত্রৈ-মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

—লেখক

সুকিয়া স্ট্রীটের কাছাকাছি আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর লাল রঙের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা হঠাৎ চোখে পড়ার কথা নয়, কিন্তু তাহলেও চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড দুটো নিমগাছ এমনভাবে ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, জায়গাটা সারাক্ষণ ছায়ায় ঢাকা থাকে। আর শোনা যায় পাখির অশ্রান্ত কিচিরমিচির। রৌদ্রক্লান্ত কোনো পথচারী পেভমেণ্ট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এখানে এসে পৌঁছলে ভাববে, আহা, এ যেন ঠাণ্ডার স্বর্গ। এবং তখন চোখ তুলে লাল রঙের দোতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে পথিক এ-কথাও ভাবতে পারে—বাড়ির সামনেটা যখন এমন ছায়াচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ, ভিতরটাও বুঝি তাই! হয়তো তাই। বাইরে থেকে কি আর তেমন বোঝা যায়। হ্যাঁ, এটা সত্য, বাইরে দুটো গাছের মাথায় সারাক্ষণ যেমন পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে, ডালে পাতায় ঠোঁট ঘষছে আর পাকা নিমফলের মদির গন্ধে দিশেহারা হয়ে শব্দে গানে আকাশ-বাতাস মুখর করে রাখছে, ভিতরটা, বাড়ির সমস্ত অন্তঃপুরটা যেন আবার তেমনি বড় বেশি চুপচাপ। অবশ্য নিচের তলার রাস্তার দিকের বড় দুখানা কামরা নিয়ে একটা ডিসপেন্সারী। সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত দরজা খোলা আছে। তাহলেও এখানে যে খুব বেশি লোক ওষুধপত্র কিনতে আসে তাও না। সুদর্শন চেহারা, অল্প বয়স, স্যুট-পরা চশমা-চোখে যে ভদ্রলোক ডিসপেন্সারীর একটা টেবিল আঁকড়ে সারাক্ষণ বসে আছেন, তিনি এই ওষুধের দোকানের মালিক এবং পাশকরা ডাক্তার। দরজার পাশে দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা ছোট্ট একটুকরো কাঠের ওপর ইংরেজীতে লেখা রয়েছে

—Sudhansu Chakraborty, M. B. সুদর্শন হলেও ডাক্তারের চেহারা, চলতি কথায় যাকে বলে, কেমন যেন 'নিরামিষ গোছের'। যেমন গোটা বাড়িটা গম্ভীর তেমনি তিনিও গম্ভীর। হাসি নেই, কথা নেই। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বয়সের তুলনায় তাঁর চোখ দুটো একটু বেশি ক্লান্ত বিমর্ষ, সবসময় একটা অসহায় ভাব লেগে আছে চোখেমুখে। কারণ জানা যায় না। তবে এমনও হতে পারে নতুন পাশ করে বেরিয়েছেন, অভিজ্ঞতা কম, এখনও লোকের কাছে তেমনভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন না, সারাদিনে একটি কি দুটি রুগী যদি ডাক্তারের ব্যবস্থা বা পরামর্শ নিতে ডিসপেন্সারীতে আসে, বাইরের 'কল্' একেবারে নেই, এবং কবে কোনদিন পশার জমবে, নাকি এমনি কাটবে, আর যদি তাই হয় তাঁর পরামর্শ বা ব্যবস্থা ছাড়া বাইরের 'প্রেসক্রিপশান' নিয়ে তাঁর দোকানের ওষুধ কিনতে সাধারণ খদ্দেরের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়বে কিনা—এ-সব চিন্তায় তিনি এমন মনমরা হয়ে আছেন। কম্পাউণ্ডার বা অ্যাসিস্টেন্ট বলতে তাঁর কেউ নেই। আছে, তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের একটা ছেলে। ঝাড়পোছ করে, বাইরের টিউবওয়েল বা রাস্তার ট্যাপ থেকে বালতি করে জল বয়ে এনে ডাক্তারের কুঁজো ভরে রাখে, ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডের পাশে রবারের নল-পরানো ড্রামটা ভরে রাখে, দরকারমতো মোড়ের রেস্টুরেণ্ট থেকে ডাক্তারবাবুর জন্য কি তাঁর কেউ বন্ধু এলে চা-টা ডিম-টা এনে দেয়, আর (দিনে একবার বড়জোর দুবার, কোনোদিন একবারও না) ডাক্তারকে যদি কোনো রুগীর জন্য মিকশ্চার তৈরি করে দিতে হয় তো ছেলেটিকে আগে থাকতেই চটপটে হাতে এক টুকরো কাগজ ভাঁজ করে তারপর সেটি গভীর মনোযোগ দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সুন্দর 'দাগ' তৈরি করে ফেলতে দেখা যায়, এবং মিকশ্চার তৈরি হওয়ামাত্র আঠা

লাগিয়ে দাগটা শিশির গায়ে এঁটে দেয়। কাজটা করার সময় ছেলেটির চোখে মুখে বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব ফুটে ওঠে। তেমনি কাজ সারা হয়ে গেলে তার মুখখানা প্রসন্ন দেখায়। যেন মিকশ্চারের শিশির গায়ে দাগ পরানোর মধ্যে ডাক্তারী-বিদ্যার কিছুটা স্বাদ পায় সে, তাই এই কাজে তার উৎসাহ ও আনন্দটা লক্ষ্য করার মতন। বাকি সময়টা ছেলেটিকে পা ঝুলিয়ে বাইরে রকের ওপর বসে থাকতে দেখা যায়। পরনে একটা হাফপ্যাণ্ট, আধময়লা ও একটু ছেঁড়া-মতন একটা গেঞ্জি গায়ে, ডাগর চোখ, চুলগুলো কালো এবং কোঁকড়া, শ্যামলা রঙ, মোটের ওপর ছেলেটিও প্রিয়দর্শন। তবে ডাক্তারের মতো নিরামিষ ভাবটা তার চোখেমুখে নেই। না থাকারই কথা। চোদ্দ বছর বয়সের একটি কিশোরের স্বভাবসুলভ সজীবতা, উৎসাহ ও আবেগ নিয়ে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে সে নিমগাছের ডালে-ডালে চড়ই বুলবুলি কাক শালিখদের হুটোপাটি ছুটোছুটি, নিমফল খাওয়া, কি ফল খেয়ে ঠোঁটঘষা দেখে।

ডিসপেন্সারীটা সদরের সামিল। বাড়ির ভিতরের সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই। ভিতরে যাবার আলাদা রাস্তা। বাঁ-হাতি একটা সরু পথ একটু বেঁকে ভিতরের দিকে চলে গেছে। পথের দুধারে পাতাবাহার ও দুটো-একটা মৌসুমী ফুলের চারা চোখে পড়ে। কিন্তু সবগুলো কেমন অর্ধমৃত, ধূলিমলিন। যেন কেউ শখ করে ঝোঁকের মাথায় বাগান করবে বলে এগুলো পুঁতেছিল, তারপর আর যত্ন নেয় নি, যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। একটা গাছও বাড়ে নি কি নতুন পাতা মেলে নি, কি মেলতে আরম্ভ করেছিল জলের অভাবে শুকিয়ে গেছে, পাতাগুলোর বেশির ভাগই দেখা যায় পোকায় খাওয়া। সরু পথের কিছুটা অগ্রসর হলে ভিতরের দিকের বারান্দা। বারান্দাটা ভাঙা ইঁট ও পুরানো রাবিশে বোঝাই করে

রাখা হয়েছে। তার মাঝখান দিয়ে দোতলায় ওঠার লোহার ঘোরান সিঁড়িপথের কাছে যেতে হয়। পুরানো সিঁড়ি। ওঠার সময় বেশ একটু কাঁপে। অনভ্যস্ত কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় ভয় পেতে পারে, হুড়মুড় করে ওটা না ভেঙে পড়ে। না, ইঁট ও রাবিশ-বোঝাই বারান্দার ডানহাতি আরও একটা কামরা চোখে পড়ে। কিন্তু দরজা বন্ধ। একটা তালা ঝুলছে। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখা য়ায় কালিঝুল ও মাকড়সার জালে সমাচ্ছন্ন ছোট একটা জানালার একটা পাল্লা বন্ধ, একটা পাল্লা খোলা। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। অন্ধকার সয়ে গেলে চোখে পড়বে ভাঙা টেবিল চেয়ার খাট মাদুর ছেঁড়া বিবর্ণ ত্রিপলে সে-ঘর বোঝাই হয়ে আছে। এ-সব সম্পত্তির মালিক কে এবং কোনোদিন এগুলো ঘর থেকে বার করা হবে কিনা দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। আমাদের অবশ্য তার উত্তর জেনে লাভ নেই এবং প্রয়োজনও নেই। আমাদের লক্ষ্য দোতলা।

ঘোরানো সিঁড়ি শেষ হতে এক ফালি ঢাকা বারান্দা। করিডোর বলা যায়। একটু অন্ধকার মতন হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন। তকতকে ঝকঝকে মেঝে। করিডোরের যেখানে শেষ সেখানে একটা জলের কল এবং জায়গাটার খানিকটা অংশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঠিক বাথরুম বলা চলে না তবে আব্রু বাঁচিয়ে মেয়েরাও স্নান করতে পারে। দেয়াল খুব উঁচু নয়, কাজেই ওধারে কেউ থাকলে এধার থেকে চুল মাথা, আর মানুষটি যদি লম্বা হয়, ঘাড় গলা পর্যন্ত দেখা যায়।

করিডোরের বাঁ-দিকে (বাথরুমের দিকে যেতে) দুটো কামরা। ডান দিকে, ঠিক তিনটে বলা যায় না, দুখানা বড় এবং একখানা ছোট নিয়ে আড়াইখানা কামরা। ডান পাশের কামরাগুলোর সব

কটা দরজায় পর্দা ঝুলছে। বাঁ পাশের কামরা দুটোর একটির দরজায়ও পর্দা নেই। একটা ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ আর একটা ঘরের দরজার দুটো পাল্লাই হা-খোলা হয়ে আছে। কাজেই বাইরে থেকে সে-ঘরের ভিতরের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। ছোট একটা খাটের ওপর একটি বারো-তেরো বছর বয়সের ছেলে শুয়ে আছে। খাটের পাশে একটা টিপয়। তার ওপর একটা বিস্কুটের টিন। যেন টিনের মুখটা এইমাত্র কাটা হয়েছে। ঢাকনাটা ওপরের দিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে রাখা হয়েছে আর সেটা আয়নার মতো ঝকঝক করছে। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে টিন থেকে একটি-দুটি বিস্কুট তুলে মুখে পুরছে আর মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে পাশের কামরার দিকে তাকাচ্ছে। বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে আবার ঘাড়টা বালিশের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিস্কুট চিবোয়। গায়ে একটা গেঞ্জি, কোমর পর্যন্ত দুটো পা একটা পাতলা চাদরে ঢাকা। বস্তুত ছেলেটির দুটো পা-ই এত শীর্ণ যে দেখলে বিশ্বাস হয় না ; যেন চাদরের তলায় অত্যন্ত সরু দুখানা কাঠ কি লোহার রড শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ছেলেটির কোমর থেকে আরম্ভ করে সবটা নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে আছে। তার দাঁড়াবার, এমন কি উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। দুবছর আগে সে দুরন্ত টাইফয়েডে ভোগে। তারপর থেকে এই অবস্থা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে দিন-দিন সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। পা দুটো যেমন শুকিয়ে গেছে তেমনি বুক, গলা, দুখানা হাত ক্রমশ শীর্ণ হয়ে আসছে। বিস্কুটের জন্য ও যখন টিনের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল হাতটা কাঁপছিল। তার খাটের উল্টো দিকে আর একটা বড় খাট। সেখানে এখন কেউ শুয়ে নেই। একটা সবুজ রঙের সুজনী দিয়ে বিছানাটা ঢাকা। খাটের পাশে একটা বড় ড্রেসিংটেবিল। টেবিলের ওপর

কিছু জিনিসপত্র রাখা হয়েছে। তবে বেশির ভাগ যেন ওষুধের শিশি, বাক্স মনে হয়। ওষুধের মধ্যে বেশির ভাগই নানারকম ভিটামিন-বড়ি, ইঞ্জেকশনের ফাইল। একটা আলমারি টেবিলের ডান পাশে দাঁড় করানো। আলমারির ওপরের অংশটা কাপ ডিশ এবং ঐ ধরনের আরো কিছু বাসনপত্রে বোঝাই। নিচের অংশে কিছু বই ম্যাগাজিন রাখা হয়েছে। সেগুলো বড় এলোমেলো অবস্থায় আছে। যেন কোনো-কোনো সময় একটা বই কি একটা ম্যাগাজিন টেনে নামানো হয়, তারপর তুলে রাখার সময় যা করে হোক ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আলমারির সামনে আর একটা ছোট টিপয়ের ওপর একটা ফুলদানি। অনেকদিন আগে ফুল রাখা হয়েছিল। ফুল শুকিয়ে ঝরে গেছে, শুকনো ডাঁটাটা মাথা জাগিয়ে আছে। আলমারির উল্টো দিকের দেয়ালের ব্র্যাকেটে কিছু কাপড়-জামা, মনে হয় ছেলেটিরও একটা-দুটো শার্ট-হাফপ্যান্ট ঝুলছে। বাকি যে কখানা জামা-কাপড় দেখা যায় সেগুলো বয়স্ক কোনো পুরুষের। লক্ষ্য করলে সহজেই চোখে পড়ে এ-ঘরে কোনো মেয়েছেলের জামা কাপড় বা তার ব্যবহারোপযোগী একটি জিনিসও নেই। না থাক, ঘরে ঢুকলে সর্বাগ্রে যে-জিনিস চোখে পড়ে সেটা কিন্তু একজন মহিলার ফটো। ফুলসাইজ নয়, বুক পর্যন্ত, তাহলেও ব্রোমাইড-করা প্রকাণ্ড ছবি। বেশ চওড়া ফ্রেমে বাঁধিয়ে ছেলেটির খাটের পাশে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। এমনভাবে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে যে ছেলেটি শুয়ে থেকে ছবিটি দেখতে পারে। আর যে-কেউ দেখে অবাক হবে ছেলেটির মুখের সঙ্গে মহিলার মুখের কী আশ্চর্য মিল! সেই চোখ নাক চিবুক। তবে একটি মুখ স্বাস্থ্যের লাবণ্যে যৌবনের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত, আর একটি করুণ ক্ষীণ রুগ্ন ক্লান্ত। হ্যাঁ, ফটোর চেহারার বয়স এবং ছেলেটির বয়স মিলিয়ে যে-কেউ আন্দাজ করতে

পারবে মা ও ছেলে। মহিলা—প্রতিমা সান্যাল বেঁচে নেই। দুবছর আগে টাইফয়েডে মারা যান। মা ছেলে একসঙ্গে অসুখে পড়েন। বাবু (ছেলে) বাঁচল, কিন্তু সর্বনাশা রোগ তার কি করে গেছে তা এতক্ষণ বলা হয়েছে।

এখন পাঁচটা বাজে। তাহলেও আষাঢ়ের বেলা। বাইরে প্রচুর রোদ। বাবুর পায়ের দিকের জানালা দিয়ে রোদ বাঁকা হয়ে ঘরের মেঝেয় পড়েছে। হাওয়াটা একেবারে বন্ধ হয়ে আছে বলে কেমন একটা গুমট গরম পড়েছে। শুধু বিস্কুট চিবিয়ে বাবুর ভালো লাগছিল না। গলা, জিহ্বা কেমন আঠ-আঠা শুকনো-শুকনো ঠেকছে। তাই আর একবার বালিশ থেকে মাথা তুলে পাশের কামরার দিকে তাকিয়ে সে ক্ষীণ গলায় বলল, 'দুধ গরম হয়েছে মাসি?'

'হ্যাঁ, বাবা।' পাশের ঘর থেকে একজন বলল, 'এইবেলা ফুটবে। তা, এটা দিয়ে কি ছাই দুধ জ্বাল হয়। তিনবার নিভল। এখন আমি কাগজ ঘুটে জ্বেলে তোমার—' বাকী কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা গেল না, একটা বাসনের শব্দে কথা চাপা পড়ে গেল।

বাবু এ-ঘর থেকে বলল, 'আমি আজ বাবাকে বলব স্টোভটা দোকান থেকে সারিয়ে আনতে।' একটু থেমে পরে আবার পাশের ঘরকে উদ্দেশ করে আস্তে-আস্তে বলল, 'তা, কী দরকার ছিল অত কষ্ট করে দুধ ফোটাবার। এখন একটু হরলিক্স খেলে হত না?'

'না গো বাবা, হরলিক্স আর কত খাবে! সকালে খেয়েছ, দুটোর সময় তো ঐ করে দিলাম। তাজা দুধ একটু না খেলে দেহে বল হবে কেন, শরীরটা সকাল-সকাল সারবে না যে!' বলতে বলতে তলায় কাপড় দিয়ে ধরে একটা বড় কাঁসার বাটি হাতে বুড়োমতন একটি স্ত্রীলোক এ-ঘরে এসে ঢুকল। দুধ দেখে বাবুর মুখ প্রসন্ন হয়।

'তা, দাদাবাবুর আর কখন সময় হয় ওটা সারাই করতে দোকানে নিয়ে যাবে। সকাল নটায় তো বেরোয়, ফেরে রাত নটায়।' নিজের মনে কথাগুলো বলতে বলতে স্ত্রীলোকটি টিপয়ের ওপর গরম দুধের বাটি নামিয়ে রেখে আলমারির কাছে সরে গেল। একটা কাচের গ্লাস ও চামচ হাতে করে ফিরে এসে বাবুর খাটের পাশে বসল। 'দেখি, আমি আজ যাবার সময় স্টোভটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি কিনা। আমাদের পাড়ায় অতুলের কাছে তো নিয়ে যাই। তা ও হারামজাদা সারাইয়ের জন্যে আবার কত হাঁকে কে জানে। ওর তো ভাতের পয়সার আগে মদের কড়ি যোগাবার তাগিদ বেশী—হুঁ, মিনসে রোজগার কি আর কম করে, মদ খেয়ে-খেয়ে সব উড়িয়ে দেয়।' বাটির দুধ কাচের গ্লাসে ঢেলে সে চামচ দিয়ে ঘন-ঘন নাড়ে। 'আর বৌটা রাতদিন কাঁদে। সোনাদানা তো দেবে না, হারামজাদা ভালো একখানা শাড়িকাপড় পর্যন্ত কিনে দিলে না মেয়েটাকে। বছর ঘুরল বিয়ে করেছে।'

'দাও, মাসি, এইবেলা জুড়িয়েছে নিশ্চয়।' বাবু দুধের গ্লাসের জন্য হাত বাড়ায়।

'তুমি কি নিজের হাতে খেতে পারবে বাবা, পারবে না, আমি গ্লাসটা ধরছি, তুমি মাথাটা একটু তুলে ধর,—না না, ওমনি পারবে না, কাজ নেই, এভাবে কতক্ষণ মাথা তুলে রাখা যায়।' হাতের গ্লাস টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে মাসি একটা পাশবালিশ তুলে ছেলেটির ঘাড়ের তলায় গুঁজে দেয়। তারপর দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে ওর ঠোঁটের কাছে বাড়িয়ে দেয়। এবার বাবু আরামে, প্রায় চোখ বুজে, চুকচুক করে সবটা দুধ শেষ করে ফেলে। শূন্য গ্লাস টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে মাসি তোয়ালে দিয়ে ছেলেটির মুখ মুছিয়ে দেয়।

'কেমন পাগলা গরম পড়েছে, ছ্যাখো।' তোয়ালেটা রেখে দিয়ে মাসি ময়লা আঁচলটা দিয়ে নিজের কপাল গলার ঘাম মুছতে লাগল। 'আষাঢ় পড়েছে, তেমন করে এখনো বর্ষাই নামল না। এবার লোকের কপালে ত্বখ্যু আছে। পাঁজির কথা শাস্ত্রের কথা।'

বাবু ফ্যালফ্যাল করে কখনও মাসির মুখের দিকে কখনও হলুদের দাগ-ধরা মাসির হাতের মোটা-মোটা আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে চুপ করে কথা শুনছিল। সারাদিন মাসি অনেক কথা বলে, অনেক গল্প করে। শুনতে বাবুর ভালো লাগে। সময়টাও কেটে যায়। যদি কথা না কয়ে চুপচাপ ঘরের কাজ নিয়ে শুধু মাসি মেতে থাকত তো বাবুর একলা বিছানায় শুয়ে থাকা অসহ্য ঠেকত। আর মাসি তা হতে দেবে কেন। প্রতিমার আমলের ঝি হরির মা। স্ত্রীকে শ্মশানে পুড়িয়ে অসুস্থ ছেলের কথা ভাবতে-ভাবতে নীরদ সেদিন পাগলের মতো বাড়ি ফিরেছিল। কিন্তু ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ পেল নীরদ ঠিকে ঝি হরির মাকে দেখে। অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোক। শহরের ঝি-চাকর সম্পর্কে নীরদ অন্যরকম ধারণা পোষণ করত। তারা ফাঁক পেলে কামাই করে, সুযোগ পেলে ঘরের জিনিস সরায়, ব্যক্তিগত জীবন তাদের জঘন্য কুৎসিত। কিন্তু হরির মাকে দেখে নীরদ সেই ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছে। কালো বেঁটে ঘাড়-মোটা থ্যাবড়া-নাক একটা সাধারণ ঝির মধ্যে যে এত স্নেহ-মমতা বিবেক-বিচক্ষণতা লুকিয়ে আছে তা নীরদ জানত না। এই নিয়ে নিরদ তার নিচের তলার সেই ডিসপেন্সারীর ডাক্তার বন্ধু সুধাংশুর সঙ্গে কথা বলেছে। সুধাংশু সায় দিয়েছে। মাথা নেড়ে বলেছে, 'আছে, অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের মধ্যেও মাঝে-মাঝে এমন কাউকে দেখা যায় যার মধ্যে রোগীর শুশ্রূষা করার সহজাত ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। অনেক সময় প্রফেশন্যাল

নার্সরাও এমন চমৎকার সেবাযত্ন করতে পারে না।' নীরদ বলেছিল 'আমি শুধু ক্ষমতার কথা বলছি না,—হার্ট, যতক্ষণ ও ছেলেটার পাশে থাকে, আমি লক্ষ্য করি, যেন প্রাণ ঢেলে দিয়ে সেবাযত্ন করে। টু স্পীক দি ট্রুথ, প্রতিমা মারা গেছে, আমি কাঁদছি না এখন, কিন্তু হরির মার চোখের জল তো শুকোচ্ছে না। যেন নিজের মার পেটের বোন মরেছে।' 'এককথায় কাইণ্ড-হার্টেড আর কি। যাক ভালোই হল,' ডাক্তার-বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, 'অল টাইমের জন্যে ওকে রেখে দাও। খুব ভালো হল। তুমি তো আর মাসের পর মাস অফিস-কাছারি কামাই করে বাড়িতে বসে থাকতে পারছ না। ছেলেকে দেখবার জন্যে একজন কাউকে রাখতে হচ্ছিল।' হালকা নিশ্বাস ছেড়ে নীরদ বলেছিল, 'ও ইয়েস, আমি অলরেডি ওকে বলেওছি। আমার আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই যে এখানে এসে থাকবে—ছেলেকে দেখবে। আর তা ছাড়া, ধর, একটা প্রাইভেট নার্স-ফার্স রাখতে গেলে কত টাকার ধাক্কা—বরং হরির মাকে কিছু টাকা বাড়িয়ে দিলে, কী বল?' 'না না, কিছু দরকার নেই, নার্স রাখতে যাবে কেন, আমি তো আছিই; এখন রুগীর কাছে একজন থাকতে হয়,—তা তোমার ওই হরির মা-ই বরং ভালো। বেশ পারবে, পারছে তো।'

সেই থেকে হরির মা। ভোর ছটায় এ-বাড়ি আসে, রাত নটায় নীরদ ঘরে ফিরলে তার ছুটি। কিন্তু তাও রাত্রে থাকতে পারে না বলে কি হরির মা কম দুঃখ করে। 'পোড়ার একটা সংসার পেতেছি, নইলে কি আমার প্রাণে সয় তোকে ছেড়ে যেতে।' মাসি আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। বাবু কথা বলে না। বড়-বড় চোখ দুটো মেলে মাসিকে দেখে। 'তাও বাবা তারকেশ্বরকে ডেকে-ডেকে অসুখটা যদি সারালাম কিন্তু আজও তো আমার খোকনকে

দুপায়ের ওপর দাঁড় করাতে পারলাম না।' এ-কথা বলার পর মাসির দু-চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ে। বাবু তখন আর মাসির মুখের দিকে তাকাতে পারে না। তারও চোখ ছলছল করে। ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালে টাঙানো মার মুখ দেখে, চোখ দেখে। কিন্তু সে-চোখ স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, যৌবনের সুষমায় দীপ্ত প্রখর মদির। একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকলেই বাবু কেমন ক্লান্তিবোধ করে। তাই আবার ঘাড় ফিরিয়ে মাসিকে দেখে। যেন এখানেই সান্ত্বনা, এই চোখের জল, হলুদের দাগ-লাগা হাত, মোটা থ্যাবড়া নাক, লম্বা-লম্বা নিশ্বাস বাবুকে অনেক বেশি কাছে টেনে নিয়েছে। 'তুমি খামকা কাঁদছ মাসি,' বাবু পাল্টা সান্ত্বনা-বাক্য শোনায়, 'বাবা বলেছে চেঞ্জে গেলে আমি একদম সেরে যাবো, উঠে বসতে পারব, দাঁড়াতে পারব, খেলতে পারব। অফিসে ছুটি নিয়ে দু-তিন মাসের জন্য বাবা আমাকে নিয়ে পুরী কি ওয়ালটেয়ার বেড়াতে যাবে।' শুনে মাসি একটু সময় চুপ থেকে ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বাবুর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলে, 'তখন কিন্তু আবার আমার বুক খালি-খালি ঠেকবে,—তিনমাস আমার সোনামণিকে না দেখে কী করে থাকব এখন থেকে ভাবছি।' বাবুও একটু সময় চুপ করে ভাবে, তারপর রক্তহীন শীর্ণ ঠোঁট দুটো ফাঁক করে হাসে। 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে মাসি? বাবাকে বলব? সমুদ্দুর কোনদিন দেখ নি তো।' 'বলবি, দ্যাখ না বলে দাদাবাবুকে? কিন্তুক—' কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মাসি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, তারপর যেন নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে, 'আমার আবার পোড়ার একটা সংসার আছে যে—'

এভাবে গত তিনমাস ধরে দুজনের মধ্যে পুরী ওয়ালটেয়ার যাওয়ার গল্প হচ্ছে। বুঝি নীরদ একদিন বলেছিল। তারপর অবশ্য

একদিনও বলে নি বা বলছে না। বাবা অফিসে ছুটি পাচ্ছে না, নাকি চেঞ্জে যাবার কথাটা ভুলে গেছে বাবু ঠিক বুঝতে পারে না। তাই মাসিকে কথাটা বলে এবং এই নিয়ে ওর সঙ্গে একটু গল্প করা শেষ করে জানালার দিকে চোখ রেখে ভাবে। রোদের চড়া রঙ কমে গিয়ে এখন নরম কমলা রঙ ধরেছে। জানালার বাইরে বড় নিমগাছ-টার পাতাগুলো তাই ভারি সুন্দর দেখায়!

'কলের জল চলে যাবে, ভিটাটিন বড়িটা তো খাওয়া হল না সোনা।'

মাসির কথায় বাবুর চমক ভাঙে। জানালার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনে। শীর্ণ ফ্যাকাশে ঠোঁটে আর-একটু হাসি উঁকি দেয়— 'আমার মনেই নেই। দাও, হ্যাঁ, ওই নীল শিশিটা।'

মাসি উঠে গিয়ে টেবিল থেকে ওষুধের শিশি নিয়ে আসে। তারপর একটা ক্যাপস্যুল বার করে বাবুর মুখে তুলে দেয়। 'জল?' 'না,' চোখ বুজে বাবু ওষুধ গিলে ফেলে—'এখন জল ছাড়াই গিলতে পারি।' মাসি কথা না কয়ে শিশিটা যথাস্থানে রেখে আসে। বাবু তখনও মিটিমিটি হাসছে। 'কি হল?' মাসি আবার আঁচল দিয়ে কপাল মোছে। 'এমন বাঘা গরম পড়েছে!' সে-কথায় কান না দিয়ে বাবু আস্তে-আস্তে বলল, 'বছর ঘুরে গেল ওই ভিটামিন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তোমার হাতেই খাচ্ছি, আর তুমি আজো ভিটাটিন কথাটা ছাড়তে পারলে না, তাই তো হাসি।' 'কি জানি বাবা,' মাসি মুখটা বিকৃত করল—'আমি তো আর নেকাপড়া শিখি নি, মুখ্যু মানুষ, ইংরিজি কথা আমার জিভে আসবে কেন।' ঘুরে দাঁড়ায় মাসি। কি যেন ভাবে, তারপর নুয়ে বাবুর কপালে হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'যাই, উননে আঁচটা দিয়ে আসি, বেলা গেছে।'

মাসি পাশের ঘরে চলে যেতে বাবু আবার ঘাড় ফিরিয়ে জানালার বাইরে নিমগাছটার দিকে চেয়ে রইল।

দুই

সরু বারান্দার মতো প্যাসেজের ওপাশে আড়াই কামরার ফ্ল্যাটেও উননে আঁচ পড়েছে। পড়েছে একটু আগেই, এখন উনন ধরে গেছে। কিন্তু কড়াই বা হাঁড়ি চাপানো হয় নি। সব কটা কয়লা রক্তচক্ষু হয়ে যেন একটি মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ফরসা মুখ আগুনের আভায় লাল টুকটুকে মাকাল ফলের রঙ ধরেছে। কিন্তু সেই রঙ দেখে যদি কেউ মুগ্ধ হয়, যুবতীর আনত স্থির অবিশ্বাস্যরকম কালো চোখ জোড়া দেখলে ভয় পাবে। কেননা সেই চোখের দাহ দীপ্তি তেজ ধার যা-ই বলা যাক না জ্বলন্ত কয়লার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। যেন গনগনে উননটাকে চোখের ধমকে অপেক্ষা করতে বলে যুবতী গভীরভাবে কি চিন্তা করছে। ময়লামতন ছোট হাতার একটা ব্লাউস গায়ে, পরনের মোটা তাঁতের শাড়িখানারও পাড়ের রঙ গিয়ে আঁচলের সুতো উঠে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা ধরেছে। কিন্তু তা হলে হবে কি, চোখের ধার দিয়ে সে যেমন আগুনকে শাসন করছে তেমনি ময়লা ব্লাউস ছেঁড়া শাড়ির ভ্রূকুটি বা ঠাট্টা তুচ্ছ হয়ে আছে প্রখর উজ্জ্বল সুঠাম শরীরের ঐশ্বর্যের কাছে। কেউ যদি এখন ওর পিছনে এসে দাঁড়ায়, জামাকাপড়ের সমালোচনা করবে কি, তার আগেই তার চোখ কেড়ে নেবে যুবতীর ঘাড় ও পিঠের সুন্দর বাঁক, মেদবর্জিত কোমরের দুপাশের মসৃণ ঢালু সুডোল নিতম্ব, দুটি রক্তিম গোড়ালি। হাঁটুর ওপর ঠেকানো দু-হাতের তেলোর মাঝখানে

থুঁতনির ভর রেখে চুপচাপ বসে ও ভাবছে তো ভাবছেই। দেয়ালে কড়িকাঠে কালি জমে-জমে ঝুল নেমেছে। বাঁ দিকে একটা কাঠের বাক্সের ওপর মসলাপাতির কৌটো, তেলের শিশি, নুনের ভাঁড়। বাক্সের পাশে একটা মিটসেফ্। ডালা দুটো হা-খোলা হয়ে আছে। মিটসেফের ভিতরে একটা এলুমিনিয়মের বড় ডেকচি ও একটা কাঁসার বাটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। না, বাটিতে যেন কিছু চিংড়িমাছ রয়েছে, বেশ লাল করে ভেজে রাখা। আর, আর কি, একটা পিতলের কলস, দু'তিনটে বড় বালতি একপাশে দাঁড় করানো। সবগুলো জলে ভর্তি। কিছু থালা বাটি গ্লাস। সবগুলো মেজেঘষে ঝকঝকে করে মেঝের ওপর উপুড় করে রাখা হয়েছে। যেন একটু আগে বিকেলের কলের জলে সব ধুয়ে-মেজে আনা হয়েছে। এখনও ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরছে। এবং এটাও লক্ষ্য করা যায় জ্বলন্ত উনন সামনে রেখে বসে-বসে যে ভাবছে তার মাথার চুলও ভেজা। হ্যাঁ, বাসন-কোসন ধুয়ে তিনটে ঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়ে সাফ করে তারপর বারান্দা পর্যন্ত ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছে এবং এটা-ওটা আরও পাঁচরকমের গোছানোর কাজ সেরে মালা কলের জলে স্নান করে এসেছে। সেই বেলা তিনটে থেকে কাজ শুরু হয়েছিল। বুঝি এতক্ষণ কিছু ভাববার চিন্তা করবার অবসর ছিল না তার। এখন চিন্তাটা তাকে এত বেশি পেয়ে বসেছে যে উননে ভাতের হাঁড়ি চাপাবার আগে কেটলিতে একটু জল ফুটিয়ে চা করে খাওয়া দরকার—সে কথাও ও ভুলে আছে। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি ডেকে উঠতে মালা সেদিকে চোখ ফেরাল। টিক্ টিক্ টিক্—সত্যি সত্যি সত্যি—সিমেন্টের ওপর তিনবার আঙুলের টোকা মেরে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে মালা উঠে দাঁড়াল। একটা বাঁকা হাসি ওর ঠোঁটে এখন উঁকি দিয়েছে। যেন এতক্ষণ ও যে-কথা

ভাবছিল, যে-প্রশ্ন ওর বুকের মধ্যে আঁকশি হয়ে গেঁথে ছিল তার জবাব পেয়েছে। সত্যি সত্যি সত্যি—আর ভয় নেই, আর এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। মালা হাত বাড়িয়ে মিটসেফের ভিতর থেকে ভাতের হাঁড়িটা টেনে নামাল। নামিয়ে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে কান খাড়া করে ধরল। ই—ই—ই—পিছি, পিছি—ই—ই—ই। পাশের ঘর থেকে কান্না ভেসে আসছে। যে সুন্দর সুখের হাসিটুকু মালার ঠোঁটের কিনারে এইমাত্র উঁকি দিয়েছিল তা মিলিয়ে গেল ঠোঁট কঠিন হয়ে উঠল, চোখ দুটো আবার জ্বলতে লাগল। ই—ই—ই—পিছি পিছি—

ঝড়ো হাওয়ার মতো মালা পাশের ঘরে ছুটে গেল। 'কি, কি হয়েছে, দুধ খাইয়ে এইমাত্তর তো ঘুম পাড়িয়ে গেলাম, এখুনি জেগে উঠে জ্বালাতে শুরু করলি।'

দেড়বছরের শিশু ধমক খেয়ে বোবা অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। 'ও, আপনি কাঁথা অয়েলক্লথ আবার ভিজিয়েছেন।'

নাকমুখ কুঁচকে মালা কটমট করে শিশুর দিকে তাকায়। 'আর পারি না, আর আমি পারব না।' কাঁথা পালটে দিতে-দিতে মালা নিজের মনে কথা বলে। 'বাঁদীর মতন সারাদিন খাটুনি কত সয়। হাঁড়ি ঠেলে-ঠেলে আর বাচ্চা রেখে-রেখে আমি মরে যাব। অ্যাঁ— কখন ছটার জল গেছে, ইস্কুল ছুটি হয় উনার চারটেয়,—দু-ঘণ্টা কোথায় উনি ঘুরে বেড়ান, কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ান আমি কি আর কিছুই বুঝিনে—' হ্যাঁচকা টান মেরে শিশুটাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয় মালা। ব্যথা পেয়ে শিশু আর্তনাদ করে ওঠে। 'মর—মরে যা—তুই মরলে তবু আমার হাড় কিছুটা জুড়োয়—কিন্তু তা কি জুড়োতে দেবে তোর মা। আবার বাচ্চা বিয়োবে—বিয়োবার উদ্যোগ চলছে—'

মালা যত রেগে কথা বলে শিশু তত জোরে কাঁদে।

'এই, চুপ করলি, চুপ···চুপ···চুপ—'

পিসির চোখমুখের ভঙ্গী দেখে শিশু আরও ভয় পায়, আরও জোরে কাঁদে। 'বাপি···বাপি···বাপি···' ধৈর্যহারা হয়ে মালা শিশুর বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। উত্তেজনায়, কেমন একটা বিজাতীয় আক্রোশে মালার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, হাতের আঙুলগুলো বাঁকা করে শিশুর গলার কাছে হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করে ওঠে : 'মেরে ফেলব, গলা টিপে জন্মের মতো কান্না থামিয়ে দিই।' কিন্তু তা কি আর হয়, তা পারে না বলেই আঙুলগুলো শিথিল করে হঠাৎ কেমন অসহায়ের মতো মালা চুপ করে শিশুটার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকে, কান্না শোনে। তারপর হ্যাঁচকা টান মেরে ওটাকে কোলে তুলে নেয়। নিতে হয়। উপায় কি। 'চুপ···চুপ···চুপ···' বেশ জোরে-জোরে বাচ্চার মাথায় ঘাড়ে চাপড় দিতে-দিতে মালা পায়চারি করে। 'উঃ, মরে যাব, এই বোঝা আমাকে আর কতকাল বয়ে বেড়াতে হবে ভগবান জানে···এই—এই—চুপ—চুপ, ঘুমো···দুটো ভাত খাই বলে এমন চাকরানির মতো চব্বিশ ঘণ্টা খাটুনি, আর একজন হেসে ঢলে বাইরে ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াবেন আর ঘরে ফিরে তৈরী ভাত খাবেন—বাস্, সংসারের কুটোটা এখান থেকে ওখানে নাড়তে হয় না, বাচ্চা রাখতে হয় না—কপালে কত সুখ নিয়ে এক-একটা মানুষ পৃথিবীতে আসে কত ভাগ্যি···এই চুপ···আমি ঠিক গলা টিপে জন্মের মতো ঠাণ্ডা করে দেব···চুপ চুপ—'

প্যাসেজে জুতোর শব্দ শুনতে পেলে মালার মুখ নিশ্চয় বন্ধ হত। কিন্তু তা আর শুনল কৈ! একদিকে বাচ্চার কান্না অন্যদিকে নিজের ক্ষোভ-মেশানো চাপা গর্জন। এক হাতে বেঁটে ছাতা অন্য

হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে কখন যে রমলা পর্দা সরিয়ে দরজায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মালার চোখে পর্যন্ত পড়ল না। যখন পড়ল মালার মুখ কালো হয়ে গেল। রমলা কথা বলল না। ঘরে ঢুকে ছাতা ব্যাগ রাখল, জুতো ছাড়ল। তারপর শিশুকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ব্লাউসের বোতাম খুলে মুখে স্তন গুঁজে দিল। কথা না বলে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রফুল্ল রায় দোকান বন্ধ করে রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে ঘরে ফিরতে পারে না। ঘরে এসে আবার 'একটু চা হলে যেন ভালো হয়' এরকম চেহারা করে রমলার মুখের দিকে তাকিয়েও আজ বিশেষ সাড়াশব্দ পেল না। বুঝল স্ত্রীর মেজাজ ভালো নেই। অগত্যা জামাকাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে ভাত খেতে বসল। ঠিক তখন রমলা মুখ খুলল। বুকের মধ্যে কত রাগ দ্বেষ ক্ষোভ আক্রোশ জমিয়ে রেখে সন্ধ্যা থেকে বৌদি চুপ করে দাদার ঘরে ফেরার অপেক্ষা করছিল নিজের ঘরে বসে মালা বুঝল, শুনল— 'আমি বাইরে ফুর্তি করে বেড়াই, আমি ইচ্ছা করে দেরি করে ঘরে ফিরি,—আমার ভাত রান্না করে আমার ছেলের বোঝা বয়ে লাটসাহেবের মেয়ের হাড় কালি হয়ে যাচ্ছে—'

দাদা চুপ। একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ। বৌদি। মালা দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন হয়ে অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসে রইল। ফোঁসফোঁসানি থামিয়ে রমলা আবার শুরু করে, 'কে বলেছিল এখানে আসতে, কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এখানে এসে শেকড় গাড়তে। আমার...'

'চুপ চুপ—' দাদার গলা।

'তা তুমি আমাকে চুপ করতে বলবে না তো কে বলবে। চুপ করে আমি গরুর মতন সারাদিন খাটব। ইস্কুল ছেড়ে আবার একটা ছুটো টুইশানির চেষ্টায় এপাড়া-ওপাড়ায় ঘুরে পায়ের তলা ক্ষয় করে

ফেলব, তারপর ঘরে এসে রান্নাবান্না করব তোমারও তাই ইচ্ছে, আমি কি বুঝি না।'

'আহা সে-কথা হচ্ছে না, বলছি, রাত হয়েছে এখন খাওয়াদাওয়া করবে, এখন ঝগড়াঝাঁটি করাটা কি ঠিক।' শান্ত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ প্রফুল্ল। স্ত্রীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টায় মুখ খুলেছে, ঘরে ফিরে এতক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলছে। বাস্, যেন আগুনে ঘি পড়ল —'আমি ঝগড়া করি না, একটা বাজে ক্যারেক্টারের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়—'

'ছি ছি, তুমি কী বলছ, পাশের ফ্ল্যাটে লোক আছে।'

'থাকুক, লোকে জানে না, লোকে দেখছে না? বিয়ের বছর না-ঘুরতে যে-মেয়েকে স্বামী তাড়িয়ে দেয় তার আবার—'

'এই রমলা—' প্রফুল্ল ধমক দেয়।

'এটা কি মিথ্যা কথা, এটা কি—'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই মিথ্যা। মালার নিজের কোনো দোষ নেই।' সংযত গম্ভীর গলায় প্রফুল্ল বলে, 'আমি একদিন তোমাকে বলেছি, মানিক অত্যন্ত খারাপ টাইপের ছেলে। তা আগে তো আর জানা যায় না। বিয়ের সময় দিনকতক এরা এমন বকধার্মিক সেজে থাকে যে কারো বাবারও ক্ষমতা থাকে না কিছু বোঝে, কিছু জানতে পারে। অবিশ্যি আর-একটু খোঁজখবর নেয়া আমারই উচিত ছিল। বরানগরের কেষ্টবাবু যে আমাদের বিশেষ পরিচিত, আমার দাদার বিশেষ বন্ধু তা তো তখন জানতাম না। পরে কেষ্টদা এবং আরো দু-চারজনের কাছে যা শুনেছি তোমাকে সে-সব আমি বলেছি। কি, সেদিনও কেষ্টবাবুর ভাগ্নে আমার দোকানে এসেছিল। বলল, মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া, রাহাজানি হেন কুকাজ পৃথিবীতে নেই যা মানিক রপ্ত করেনি। সে যে কতখানি নিচু চরিত্রের ছেলে—'

'বেশ তো, তাই বলছিলাম, অনেকদিন। বলেছি তোমাকে কেস্ কর, কেস্ করে অন্তত তোমার বোনের খোরপোশটা আদায় কর। আমি আর কত—' ফোঁস ফোঁস শব্দ। 'আমার শরীর শরীর না, আমি খাটছি না ? কী দরকার আমার ঘরের বাইরে গিয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে চাকরি করার। তোমার সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি গেল, দিলুম গায়ের গয়নাগুলো খুলে, দোকান দিলে, তা চায়ের দোকান থেকে দু-চারদিন অন্তর এক-আধ প্যাকেট চা ছাড়া ঘরে আর কী আনতে পারছ তা তুমিও জান। বুঝলাম, সংসার চলে না। পঞ্চাশ টাকা ঘরভাড়া দিতে হয়, তিনটে মুখ। বাচ্চার দুধ আছে। অ্যাঁ, আমি একটা ভালো টনিক-ফনিক খেতে পারলাম না পোয়াতী হবার পর থেকে আজ অবধি। চাকরি করতে বেরিয়েছি ! তাও না হয় বুঝলাম করছি চাকরি, আনছি দুটো পয়সা, খাওয়াচ্ছি। আর কিনা আমার খেয়ে আমার 'পরে আমার ওপর তম্বি! আমাকে হিংসা ? অ্যাঁ, আমার ছেলের গলা টিপে চিরকালের মতন ঠাণ্ডা করে দিতে ওর হাত নিশপিশ করছে।'

'বলেছে এ-কথা মালা ?'

'বিশ্বাস না হয় বোনকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস কর। একটু কাঁদছিল বলে বাপিকে ও যে কী করবে ঠাওর করতে পারছিল না—বাব্বা, কী ফোঁসফোঁসানি, কী লম্ফঝম্ফ—আর আমার আদ্যশ্রাদ্ধ—দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম তো সব চোখে, কানে শুনলাম,—পারবে ও অস্বীকার করতে ?'

'মালা, মালা !'

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এক পা এক পা করে মালা দাদার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

'এসব কী শুনছি?' প্রফুল্লর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। থালার ভাত থালায় পড়ে আছে। মালা নীরব।

'না, আমার কথা হচ্ছে, তুমি কি অবস্থায় পড়েছ, কি অবস্থায় এখানে এসে তোমাকে থাকতে হচ্ছে, এটা ভুললে তো চলবে না। আমি—আমার অবশ্য কোর্টে-ফোর্টে যাবার ইচ্ছে নেই—কেননা লোকনিন্দাকে আমি চিরকাল, সেই আমার আট বছর বয়স থেকে, যমের মতো ভয় করি। আর স্কাউণ্ড্রেলটার কাছ থেকে পয়সা আদায় করা—দরকার নেই, দরকার নেই—কী হবে, আমি যদি দু-মুঠো খাই আমার বোনও খেতে পারবে। নিজের তো এই চরিত্র —আর তুই কিনা আমার বোনকে চরিত্রের বদনাম দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিলি? কী হবে তোর কাছ থেকে দশ টাকা মাসোহারা নিয়ে—তোর পয়সায় আমি থুথু ফেলি।' প্রফুল্ল থামল। উত্তেজনায় তার গলার স্বর কাঁপছিল। যেন কথা বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেছে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল। একবার স্ত্রীর দিকে তাকায়। তারপর: 'তাই আমি বলছি, এরকম করলে তো চলবে না। আমি সেই সকালে উঠে দোকানে চলে যাই, তোমার বৌদিকে কাজে বেরোতে হয়, এদিকে ঘরের রান্নাবান্না ধোয়ামোছার কাজ থাকে, একটা বাচ্চা আছে—কাজেই একজনকে সামলাতেই হবে। এখন এসব চিন্তা না করে তুমি যদি রাগারাগি কর তো—অবশ্য একলা তোমার ওপর চাপ পড়ে আমি অস্বীকার করছি না—তাহলেও যখন যে-অবস্থায়—' প্রফুল্ল থামল।

রমলার চোখ দুটো জ্বলছে। খুব অস্বস্তি বোধ করছে ও। মালা একবার সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে। দাদার গলার নরম সুরটা বৌদির মোটেই ভালো লাগছে না। তাই দাদা কথা বন্ধ করেছে কি রমলা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল, 'বুঝলাম তো, বোনকে



অনেক সান্ত্বনা দেওয়া হল, রাগটাগ না করতে বোঝানো হল, কিন্তু আমার সম্পর্কে যে ও এমন একটা সাংঘাতিক বাজে রিমার্ক করেছে তার বিচার হল কোথা, সেটা তুমি বেমালুম চেপে যাচ্ছ কেন ?'

প্রফুল্ল অনুনয়ের ভঙ্গীতে হাত তুলে স্ত্রীকে চুপ করতে বলতে রমলা গলার স্বর আর এক ডিগ্রী চড়িয়ে দিল, 'আমি বাইরে ফূর্তি করতে যাই। তাই বলছিলাম জামাই খারাপ কি মেয়ে খারাপ কে তার বিচার করে। ও নিজে খারাপ না হলে আমার সম্পর্কে এমন একটা অদ্ভুত বাজে ধারণা মাথায় আনতে পারে ?—নির্লজ্জ বেহায়া ছোটলোক কোথাকার।'

'ছি ছি ছি—তুমি' প্রফুল্ল স্ত্রীকে কি বলে বোঝাবে ঠিক করতে পারছিল না। 'যা তো মালা, তোর ঘরে যা—'

মালা নিজের ঘরে ফিরে এল। এসে বসল না। অন্ধকারে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে কান পেতে রইল। রাগে আক্রোশে তার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠছিল। তার চোখ ছুটোও জ্বলছিল। কান গরম হয়ে গেছে, গরম নিশ্বাস বেরোচ্ছে। পাশের ঘরে ছুম্ করে একটা আওয়াজ হল। তার অর্থ রমলা রাগ করে তক্তপোশের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে শয্যা নিলে। দাদার চাপা বিরক্ত কণ্ঠস্বর। কথাগুলো ভালো বোঝা গেল না। কেবল একবার শুনল মালা প্রফুল্ল নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বলছে, 'এই অশান্তি আর ভালো লাগে না,—ভগবান আমাকে এমন বিপদে ফেলেছে !'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে মালা শুয়ে পড়ল। শোবার সময় চিন্তা করল কোনো কাজ সে ফেলে এসেছে কি। না, ছুজনের ভাত থালায় বেড়ে পাশের ঘরে ঢেকে রেখে এসেছিল সে। রান্না নামিয়েই ওটা সেরে রেখেছিল। আর বাকি ভাতে জল ঢেলে হাঁড়ি তুলে

রেখেছিল। দাদা খাবে। রাগ এবং বিরক্তি কমলে এক সময় খাবেই। আর একজন খাবে কিনা এবং না খেলে দাদা সাধাসাধি করবে কিনা মালা বলতে পারে না, তা নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না। তবে তার ক্ষুধা নেই। তাই মিটসেফের মধ্যে হাঁড়িটা ঢুকিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের মেঝে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে আলো নিভিয়ে মালা দরজায় তালা ঝুলিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছে। মালা খেল কি না খেল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না সে ভালো করে জানে। এবং এর জন্য তার মনে বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। 'আমার কথা লোকে যত কম ভাবে, যত বেশি ভুলে থাকে, বিশেষ করে দাদা-বৌদি, তত ভালো'—টান-টান হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশের দুটো কোণা আঁকড়ে ধরে মালা চিন্তা করল। চোখের কোণায় বড় একটা গরম জলের ফোঁটা দাঁড়িয়েছে, মালা মুছল না, ফোঁটাটা ভেঙে গাল গড়িয়ে বালিশে পড়ল। 'রমলার সঙ্গে তো আমার ঝগড়া করার কথা নয়, তার ওপর রাগ করারও কিছু নেই। ছোটলোক বলে বলুক, নির্লজ্জ বেহায়া বলেছে বলুক।' মালা বরং নিজেকেই এখন শাসন করতে লাগল। হ্যাঁ, তার অনুতাপ হচ্ছে। কী দরকার ছিল বাচ্চাটা কাঁদছিল বলে তখন এমন রাগারাগি করার, গরম হয়ে রমলা সম্পর্কে অত সব বাজে কথা বলার। সে হাঁড়ি ঠেলবে, বাচ্চা দেখবে—এ-বাড়িতে যেদিন পা দিয়েছে সেদিন থেকেই তো তা ঠিক হয়ে গেছে। এই নিয়ে সে অভিমান করতে যায় কেন। রোগা ঢ্যাঙা কালো-রঙ রমলা। কেবল বি. এ. পাশ করেছে এই শুনে দাদা ওকে বিয়ে করেছিল। এবং বিয়ে করে দাদা সুখী, রমলা সাধ্যমতো সুখ দিচ্ছে, রোগা শরীর নিয়ে স্বামীর সংসারকে চালু রাখতে চাকরি পর্যন্ত করতে বেরোচ্ছে। এই জন্য মালা ঈর্ষা করে রমলাকে? গালে জলের দাগ কিন্তু ঠোঁটে একপলকা হাসি জাগল

মালার। যদি রমলাকে ঈর্ষা করতে হয় তো সংসারে ঈর্ষা করার আর বাকি থাকে কে। পরের সুখ দেখে তার বুকের ভিতর যদি কাঁটা খচখচ করে তো খোঁচায়-খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পচেগলে অনেকদিন আগেই তার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শেষ তো ও হতে দেয় নি নিজেকে! দেবে না। বরানগর থেকে চলে আসার সময় রিক্‌শায় বসে এমন একটা ইচ্ছা—এ-ধরনের একটা জোরালো প্রতিজ্ঞায় বুকের শিরাগুলোকে শক্ত করে তুলতে পেরেছিল বলে না আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে অত শান্তভাবে ও পা দিতে পেরেছিল। বোনের ভাগ্যবিপর্যয় দেখে দাদা কপালে করাঘাত করেছে, রমলা মুখ কালো করেছে, ঠোঁট বেঁকিয়েছে। বাস্, এই পর্যন্ত। এর বেশি তারা কিছু করে নি, করুক, মালাও চায় নি। হয়তো এখানে দোতলার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের দেয়ালগুলোর ভিতর সে আটকা পড়েছে। কিন্তু আটক থেকেও, সবচেয়ে যা তার বেশি দরকার—মন, মনের স্বাধীনতা এই কমাসে কি যথেষ্ট ভোগ করে আসছে না ও। আর কী চাই,—লম্বা নিঃসঙ্গ দুপুর, কি একলা ঘরের এমন বুকচাপা অন্ধকার রাতের সীমাহীন বিস্তারে মনকে যতদূর খুশি ছেড়ে দেওয়ার, যেভাবে খুশি একে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুখ কটা মেয়ে পাচ্ছে! সুতরাং বরানগর ছেড়ে চলে আসার সময়কার দুরন্ত ইচ্ছাই তো তার জয়ী হল। শেষ হয় নি, বরং সে বাঁচছে, বাড়ছে, বসন্তের পত্রপুষ্পশোভিত একটা গাছের মতো এই মনের মধ্যে সে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়ল যে। কেনই বা তা হবে না। উনিশ বছরের যৌবন কি বসন্তের একটি পুষ্পিত তরু নয়। শরীর টান-টান করে উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে বালিশের কোণা দুটো আঁকড়ে ধরে মালা অন্ধকার দেয়াল দেখতে লাগল। ‘বরং তুমি রমলাকে করুণা করতে পার, তার জন্যে একটু দুঃখ কর।’ মনে-মনে বলল

সে। উনিশ বছর বয়স কী ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিল মালা দেখেনি, কেননা রমলার তখনও বিয়ে হয়নি, চব্বিশ বছর বয়সে রমলার কতটুকু বাকি আছে তা চোখের ওপর দেখছে। বলা উচিত নয়, ভাবা পাপ, কিন্তু তাহলেও ভেবে এক-এক সময় মালা অবাক হয়, দাদার মতো শক্ত-সমর্থ এমন একটি সুপুরুষ কী করে দিনের পর দিন পেত্নীর মতো, শুঁটকির মতো দেখতে একটা মেয়েকে নিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। 'সেই রমলা মুখ কালো করে থেকে, চাপ-চাপ কাজের বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে, আর দেড়বছরের একটা শিশুর দুধবার্লি খাওয়ানো ও ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ভিজে কাঁথা পালটানোর দায়িত্ব বুঝিয়ে যতই চাকরি করতে বেরোক, তোমার ও কতটুকু ক্ষতি করতে পারল, তোমার হয়ে ওঠার তোমার বেঁচে থাকার কতটা বাধা দিতে পেরেছে সে ? পারে নি, পারবে না।' একটা গরম নিশ্বাস বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে মালা শরীরের আড়মোড় ভাঙল। এখানে এসে গোড়ার দিকে এপাড়ারই একটা প্রাইমারি স্কুলে একজন টিচার নিচ্ছে শুনে মালা দাদার কাছে কথাটা তুলেছিল, চেষ্টা করলে হয়ে যেতও বা! কিন্তু দাদা কথা বলার আগে বাধা দিয়েছে ওই পেত্নী। 'আমি একটা গ্র্যাজুয়েট হয়ে ষাট-সত্তর টাকার বেশি আনতে পারছি না আর ম্যাট্রিকুলেশনের বিদ্যা নিয়ে তুমি,—তোমাকে কটাকা মাইনে ওরা দেবে আমি জানি না। দেবে কিছু ঠিকই। কিন্তু তার সবটাই তখন তোমার শাড়ি শায়া ব্লাউসে খেয়ে ফেলবে। কিছু খাবে সাবানে, কিছু তেলে! ভাতের কথা ছেড়ে দাও, টিফিনের জন্যে সারা মাস দু-এক টাকার বেশি খরচ করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গেল তোমার দিক। এদিকে তুমিও বেরোবে আমাকেও বেরোতে হচ্ছে। কাজেই একটা ঝি। তার খোরাক তার মাইনে। তার অর্থ ঝিয়ের মাইনে প্লাস তোমার

খোরাক প্লাস ঝিয়ের খোরাক। আর এইসব হাতি-হাতি খরচের ধাক্কা সামলাতে হবে আমাকে এবং তোমার দাদাকে। এই লাভ হবে আমাদের তোমাকে চাকরি করতে পাঠিয়ে।' মালা আর কোনোদিন চাকরির নাম মুখে আনে নি। তার পর থেকে আরম্ভ হল দেয়াল আর দেয়াল। কিন্তু তাতে মালার লোকসান হয় নি কিছু। এই দেয়ালঘেরা এক একটা দুপুরই পলাশের আগুন হয়ে তার চোখের সামনে জ্বলতে থাকে ; রঙিন প্রজাপতি হয়ে বিকেলটা বুকের মধ্যে উড়উড়ু করে। আজও করছিল, কিন্তু মালার নিজের দোষে সব নষ্ট হয়ে গেল—রমলার বাচ্চাটাকে নিয়ে অত মাথা গরম করার দরকার ছিল কি। বাচ্চা, উনুন, ধোয়ামোছা, মাজাঘষা সব করেও যে সুন্দরভাবে মনকে বাঁচিয়ে রেখে ডালপালা মেলতে দিতে পারে, ফুল ফোটাতে পারে!

উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে মালা ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেল। তারপর দরজার কাছে সরে গিয়ে কান পেতে রইল। না, পাশের কামরা না, দাদা না রমলা না, রমলার বাচ্চা, রমলার ঘরদরজা বাসনকোসন সেলাইফোঁড় ধোয়ামোছা কয়লা ধরানো কয়লা সাজানো সব ভুলে গিয়ে রাত্রির উত্তাল কালো ঢেউয়ের ফেনার ওপর একটা ফুলের মতন নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মালা দুলতে লাগল, কাঁপতে লাগল।

তিন

আজ সকাল থেকে নীরদের মন খারাপ, অবশ্য দিনের চেহারাটা তেমনি হয়ে আছে বলা যায়। সবটা আকাশ ধোঁয়া রঙের মেঘে ঢেকে রেখেছে। একবার একটু বাতাস বইছে না। কেমন গুমোট ভাব। মাথা-ধরা গা-বমি-করা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। মনেই হয় না এ-দিনে বেঁচে সুখ আছে। এরকম একটা দিনে কী করলে ভালো লাগবে, কারো ভালো লাগছে কিনা অথবা ভালো লাগবার জন্য কেউ খাওয়ার কি কাপড়চোপড় পরার দিক থেকে না কি রোজ যে-সব কাজকর্ম করে সে-সবের একটু রকমফের করছে চিন্তা করার মতন। অর্থাৎ আমার ভালো লাগছে না, কারো লাগছে কি এবং সেটা কি দিয়ে—এই। উত্তর হয়তো নেই কিন্তু তবু ভাবতে হয়, এমন দিন, এমন বিদঘুটে আকাশের চেহারা, বিবর্ণ ধূসর চারদিক।

নীরদ হাতঘড়ি দেখল। চারটে। সেটা অবশ্য কথা নয়। ইচ্ছা করলে এখনি সে উঠে বেরিয়ে পড়তে পারে। আর পাঁচজন কর্মচারীর মতন কাঁটা মিলিয়ে ঠিক পাঁচটায় উঠতে হবে সেটা নীরদের বেলায় খাটে না। তবে পদাধিকারের সুযোগ সাধারণত সে নেয় না। ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়। তা ছাড়া উঠতে তার ইচ্ছাও করছিল না। নিজের কামরায় একলা চুপচাপ জানালার বাইরে চোখ পাঠিয়ে অনেকদিন সে এভাবে (হাতের কাজ শেষ হয়ে গেলে) বসে কাটায়। অফিসটা মন্দ না। কোথায় ব্যবসাবাণিজ্য চলছে, এখানে তার হিসাবপত্র রাখা হচ্ছে। পাট চা টিন বাঁশ অনেককিছুর কেনাবেচা আমদানী-রপ্তানীর হিসাব রাখছে মিশনরো'র এই লাল

চারতলা বাড়ি। অবশ্য ইচ্ছা করলে বেলা চারটের মধ্যে যেমন নীরদ বেরোতে পারে তেমনি এমন দিন আসে যখন রাত নটা সাড়ে-নটা পর্যন্ত বসে থেকে নীরদ স্টেনোগ্রাফারকে ডাকিয়ে ডিক্‌টেশান দেয়, কাগজপত্র টাইপ করায়, তারপর সেগুলো পরীক্ষা করে সই দিয়ে তবে তার ছুটি। যার স্বাধীনতা বেশি তার দায়িত্বও বেশি। এখন বেশ কিছু কাজ নিয়ে মেতে থাকলে যেন ভালো লাগত, নীরদ ভাবল, শরীর ও মনের আড়ষ্টতা দূর হত। টেবিলের ওপাশে সরিয়ে-রাখা ফাইলগুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েও রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু, আশ্চর্য, হাত বাড়িয়ে কিছু কাগজপত্র টেনে আনবে সেই উৎসাহ কোথায়। বরং তৎক্ষণাৎ জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ পাঠিয়ে সে বিড়বিড় করে উঠল, 'ডাল্‌, অত্যন্ত ডাল্‌ ওয়েদার। সুতরাং—'

সুতরাং এ-দিনে হাত-পা গুটিয়ে দরকার হলে চোখমুখ বুজে শামুকের মতো চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় কি। ভাবল নীরদ। হাই তুলল একটা। টিন থেকে সিগারেট তুলল। কিন্তু আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—নীরদের মন খারাপ হওয়ার, আড়ষ্ট নির্জীব হয়ে থাকার এই কি একমাত্র কারণ। নীরদ নিজের কাছে তা স্বীকার করতে পারে না। সিগারেট ধরিয়ে সে সিলিং-এর দিকে তাকায়। অবশ্য একটা মোটা রকমের কারণ সেই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত থেকে এখন তার বুকের একটা পাশ চাপ দিয়ে ধরে রেখে যন্ত্রণা দিচ্ছে। হ্যাঁ খোকা, বাবু, মা-হারা পঙ্গু রুগ্ন ছেলে, নীরদের একমাত্র ভরসা একটি ভবিষ্যৎ। অবশ্য এটা নীরদ স্বীকার করে, তার সন্তান বলে নয়, বারো বছরের আর পাঁচটি ছেলের চেয়ে বাবুর সহ্যশক্তি ধৈর্যগুণ, যা-ই বলা যাক না, বেশি, অনেক বেশি। দেখে সময়-সময় নীরদ অবাক হয়।

প্রতিমার কাছ থেকে খোকা এটা পায়নি, যদি পেয়ে থাকে—নীরদের কাছ থেকে। ধীর স্থির শান্ত প্রতিমা কোনোদিন ছিল না। একটুতে খুশি হয়েছে, চঞ্চল হয়েছে, আবার সামান্য একটা কিছুতে ভয় পেয়েছে, হতাশ হয়েছে, কান্নাকাটি করেছে। একবার—যাক, সেসব অনেক কথা। তাদের চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে ছোট বড় মাঝারি কত ঘটনাই ত ঘটেছে। নীরদের কানপুরের চাকরি ছাড়া, কলকাতায় চলে আসা, মাঝখানে প্লাই-উডের ব্যবসায় হাত দিয়ে কিছু টাকা খোয়ানো (নীরদের এখনও হাসি পায় বিজ্‌নেসে কেন সে নাক ঢুকিয়েছিল—যা সে কোনোদিনই পারেনি, পারবে না; যারা ওসব করে তাদের ধাত আলাদা, নীরদের মতো মানুষদের জন্য ধরাবাঁধা রাস্তা—চাকরি)। কিন্তু তাই বলে নীরদ অস্থির হয়ে পড়েছিল কি? আর সামান্য আড়াই হাজার টাকার জন্য প্রতিমার সে কী নিদারুণ শোক। তা-ও কি এক-আধ দিন—একটা বছর দিনরাত শুধু এক বিলাপ। তারপরই অবশ্য নীরদ এই চাকরিটা পেয়ে যায়। মাইনে এলাউয়েন্স মিলিয়ে মাসকাবারে পকেটে করে স্বামী ঘরে কত আনবে শুনেই ওর চক্ষুস্থির। হ্যাঁ, অতিরিক্ত খুশি হয়েই। আর তখনি শুরু হৈ-চৈ লাফালাফি। 'ফ্ল্যাট নাও, বালিগঞ্জের দিকে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া কর—এখানে এই বাড়িতে তোমাকে মানাবে কেন, অফিসার, চালচলন থাকা-খাওয়া সেরকম হবে, না, আমি শুনব না, উঁহু,—বা-রে—' নীরদকে অনেক বুঝিয়েসুজিয়ে প্রতিমার দেড় শ টাকার ফ্ল্যাট ভাড়া করার মোহ ভাঙাতে হয়েছিল। 'খামকা কতগুলি টাকা মাস-মাস পরের হাতে তুলে দিয়ে লাভ কি! বরং ব্যাঙ্কে কিছু-কিছু ফেলে রাখলে শহরের ওপরে না হোক বাইরের দিকে পাঁচ-সাত কাঠা জমি নিয়ে আমরা ছোট একটা বাড়ি করতে পারি—সেটা ভালো, চিরকালের মতো

মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই হয়।' তখনকার মতো বুঝিয়েছিল সে স্ত্রীকে, কিন্তু পরে এই বোঝানোর জের টানতে নীরদকে প্রাণান্ত হতে হয়েছিল। 'কৈ, তুমি জমি দেখছ না, বা-রে, কেবল খেলাম পরলাম চাকরি করলাম, তাতেই সব শেষ হয়ে গেল। আমার বাবু বড় হবে, আমার বাবুর বৌ আসবে। তুমি এখানে এনে তুলবে বৌকে ? দেড়-কামরার এই বাসায় ? আমার যেন তার আগে মৃত্যু হয়—' ব্যাঙ্কের পাশ-বই ওর চোখের সামনে তুলে ধরে নীরদ হাসত, 'আরো কিছু জমতে দাও, এখনো তিনের ঘরে অঙ্ক, চার, পাঁচ, হ্যাঁ, পাঁচের কাছাকাছি উঠলে আমি আর চুপ করে বসে থাকব না। নারকেলডাঙা হোক, সোদপুর বেলঘরিয়া বা তোমার ওদিকে যাদবপুর ঢাকুরিয়া, হ্যাঁ, টালিগঞ্জের ওধারটায়ও বেশ ভালো-ভালো জমি আছে।' 'ও বাবা,—তাহলে তো আরো পাঁচ বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে,—পাঁ-চ ব-ছ-র !' বেচারার উজ্জ্বল বিশাল চোখ জোড়া আজকের এই আষাঢ় আকাশের মতন ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেছে সেদিন। তারপর চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। 'হল না, কিছু হবে না, আমি জানতাম, বাড়িঘর আমার অদৃষ্টে নেই,—ভগবান এত সুখ দেবেন তবেই হয়েছে।' হলও তাই। পাঁচ বছর প্রতিমাকে অপেক্ষা করতে হয় নি। তার আগেই ঈশ্বর তাকে ডেকে নিল। রুমালের কোণা দিয়ে নীরদ চোখ মুছল। টাকাপয়সা বাড়িঘর তো বড় কথা, নিজের কি ছেলের কি নীরদের সামান্য পেটখারাপ বা সর্দিকাশি হয়েছে তো বেচারা এমন ঘাবড়ে গেছে ! যেদিন নীরদ সকাল-সকাল অফিস সেরে বাড়ি ফিরেছে সেদিন প্রতিমা সদ্য-পাট-ভাঙা শাড়ি-শায়া-ব্লাউজে কাজলে-কুঙ্কুমে সেজে ঠোঁটভরা হাসি আর ভ্রূবিলাস নিয়ে ঝলমল করত। একটু দেরি হয়েছে, একটু রাত হয়েছে, নীরদের আটটায় ফেরার কথা নটা বাজতে চলল তো

এক-একদিন কী বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছে প্রতিমা। আশেপাশে কারো বাড়িতে টেলিফোন নেই, ছুটে গেছে মোড়ে। সেখানে লোহা-লক্কড়ের দোকানের টেলিফোন তুলে প্রথমে অফিস, যদি অফিস থেকে নীরদের সাড়া না পেয়েছে তো—হ্যাঁ, তাই একদিন করেছিল প্রতিমা, সোজা লালবাজারে খবর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে দরজায় খিল দিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছিল আর টেনে-টেনে মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছিল। এমন অস্থির-চিত্ত ছিল ও, এমন ছেলেমানুষি করেছে চিরকাল। নীরদ কখনও ধমক দিয়েছে, কখনও আদর করে বুঝিয়েছে। আর বাবু বাবু। বাবু ছাদে যেতে পারবে না—পড়ে যাবে, খেলাধুলা করতে পারবে না—গাড়িচাপা পড়বে, রোদে যবে না—অসুখ করবে,—বৃষ্টির জল একফোঁটা মাথায় লাগিয়েছে ছেলে তো প্রতিমার হৈ-রৈ চিৎকার, ধমক, লাফালাফি।—নিউমোনিয়া হবে, আমি এই ছেলেকে বাঁচাতে পারব না, উঃ, কী খারাপ অদৃষ্ট! এমন সৃষ্টিছাড়া ছেলে নিয়ে আমি কোথায় যাব, ইত্যাদি চব্বিশঘণ্টা। প্রতিমা বুঝত না ন-দশ বছরের ছেলেকে সবসময় ঘরের ভিতর আটকে রাখা যায় না। তার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এটা করা উচিতও না। আর দশটি ছেলের মতো তাকে ছুটোছুটি খেলাধুলা করতে ছেড়ে দিতে হবে। গায়ে একটু বৃষ্টির ছাট কি রোদের ঝাঁজ লাগলে মরে যাবে না। বরং ভালো। কলকাতা শহরে আলো-বাতাসের এমনি তো অভাব। না, প্রতিমার কেবল অ্যাক্সিডেণ্ট আর অসুখবিসুখের ভয়। তা, আজ তো ছেলের এই অবস্থা। নীরদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বরং প্রতিমা আগে মরে গিয়ে ভালো হয়েছে। চিন্তা করল সে। আজ বেঁচে থেকে এই অবস্থায় বাবুকে যদি দিনের পর দিন দেখতে হত তো প্রতিমার কী অবস্থা

হত অথবা কী অবস্থা ও নিজে তৈরী করত চিন্তা করে নীরদ শিউরে উঠল। ঈশ্বর যা করে ভালোর জন্য করে। নীরদ মনে মনে বলল। হ্যাঁ, এইজন্যই ধৈর্য সহিষ্ণুতার এত দাম পৃথিবীতে। নীরদ সহ্য করছে। অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে সে অপেক্ষা করছে, দেখছে, চেষ্টা করছে,—যদি ছেলে ভালো হয়,—তাছাড়া আর কি করার আছে তার। মানুষের কর্তব্য মানুষ পালন করে। ফল ভগবানের হাতে। মাথা গরম করার অস্থির হওয়ার কোনো মানে হয় না। নীরদের সেই প্রকৃতিই নয়। আজ ছেলের এই অবস্থা বলে নয়, ছেলেবেলা থেকে নীরদ স্থির ধীর গম্ভীর সতর্ক সহিষ্ণু। তার ছেলে বাবু এই প্রকৃতি পেয়েছে। নীরদ সেজন্য সুখী। এমন অসুস্থ একটি—শিশুই বলা চলে—দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়িতে ঝি হরির মা ছাড়া আর এমন কেউ থাকে না সারাদিনে একবার একটু সময় পাশে বসে খোকার কপালে হাত বুলোয়, আদর করে। কিন্তু তাই বলে তো বাবুর অস্থিরতা আক্ষেপ নেই। রোজ বাড়ি ফিরে রাত্রে হরির মার কাছে যা রিপোর্ট পায় নীরদ। 'আমার সোনামণির মতন নক্ষী ছেলে তিন-ভুবনে তুমি পাবে নাকি গো দাদাবাবু। উঁহু। কোথায় গরম লাগছে দুশ্চিন্তায় তাড়াতাড়ি রান্না ফেলে ছুটে এসে আমি শুধোই, পাখা খুলে দেব বাবু, একটু গ্লুক্সুর (গ্লুকোজ) শরবত বানিয়ে দেব —তার উত্তর নেই, মিটিমিটি হাসি, পালটে আমায় বলে কিনা, ইস্ কী বিশ্রী ঘামছ তুমি মাসি, ভাত চাপিয়েছ? ডাল ফুটছে? তা ফুটতে দাও না, ততক্ষণ তুমি এ-ঘরে পাখার নিচে বসে একটু জিরোও। শুনছ আমার চাঁদের কথা, এটুখানি দুধের বাচ্চার বুকে কত মমতা।' বলতে বলতে হরির মার চোখে জল দাঁড়ায়। নীরদ আর কিছু প্রশ্ন করে না। গম্ভীর হয়ে অফিসের জামাকাপড় ছাড়ে।

কিন্তু হরির মা সেখানে থামে কি। 'কান্নাকাটি করবার জ্বালাতন করবার ছেলে আমার মানিক! পুতুলের মতন সারাদিন চুপটি করে শুয়ে আছে, জানালার পাখি দেখছ, ঐ-যে আবার একটা রংচং ছবি-ছাপা বই এনে দিলে, শিয়রের কাছে রাখে, আমি ও-ঘরে কাজেকম্মে থাকলে ওটা চোখের সামনে তুলে নিজের মনে নাড়াচাড়া করে, এই তো করছে সারাদিন, এট্টু শব্দ আছে মুখে ? আমি কান পেতে থাকি। দেয়ালে দেয়ালে টিকটিকি ডাকে—আমার সোনার চাঁদের তো টুঁ আওয়াজটি শুনিনে। এমন ঠাণ্ডা, এমন নক্ষ্মী।' তারপর আরম্ভ হয় হরির মার শোক : 'কত জন্মের পুণ্যি করলে এমন চাঁদের টুকরো গভ্ভে (গর্ভে) আসে, আর সেই চাঁদ ফেলে বোনটি আমার হেসেখেলে দিব্যি চলে গেল ও-হো-হো, এই তুখ্যু আমি কেমন করে সইব গো—' 'এই চুপ চুপ।' নীরদকে ধমক দিয়ে হরির মার বিলাপ থামাতে হয়। তার ছেলে শান্ত ; অসুস্থ বটে কিন্তু তার জন্য এতটুকু বেগ পেতে হয় না বোঝাতে গিয়ে হরির মা বরাবর এমন অস্থির অশান্ত হয়ে ওঠে! 'প্রতিমার আর এক সংস্করণ তার এই ঝি—' যেন নিজের মনে কথাটা বলে নীরদ এখন মৃদু হাসল। শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ছাই-দানিতে ছুড়ে ফেলে একটু সময় সে চোখ বুজে রইল। শরীরের এই অবস্থা তার ওপর সারাটা দিন একলা বিছানায় শুয়ে কাটানো, এটা-ওটা নিয়ে আবদার-অভিমান করা অস্বাভাবিক না, বিশেষ এই বয়সের ছেলের,—কিন্তু তার বাবু তাও করে না। ছেলের চিকিৎসা পথ্য শুশ্রূষা আরাম ইত্যাদি সম্পর্কে নীরদ যেমন সচেতন তেমনি ওর যাতে মন ভালো থাকে, ক্লান্ত বিমর্ষ না হয়ে পড়ে সেদিকে নীরদের প্রখর দৃষ্টি। খেলনা, ছবির বই, গল্পের বই, বোতলে জিয়ানো রঙিন মাছ, ফুল—যখন যা মনে হচ্ছে, চোখে

পড়ছে নীরদের, দোকান থেকে কিনে নিয়ে বাবুর হাতে তুলে দিচ্ছে। দু-পায়ের ওপর কবে ও সোজা হয়ে দাঁড়াবে, বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে হাঁটবে স্থিরতা নেই,—হয়তো আর হাঁটবে না কোনোদিন মনে হওয়া সত্ত্বেও নীরদ সেদিন সতেরো টাকা দিয়ে ছেলের জন্য নতুন ডিজাইনের স্যু কিনে নিয়ে গেছে। বাবু খুশি হয়েছে জুতো দেখে। দু-তিনবার ওটা বুকের কাছে তুলে নাড়াচাড়া করে পরে শিয়রের পাশে রেখে দিয়েছে। 'আমি শিগ্‌গির হাঁটতে পারব তুমি বলছ বাবা?' 'নিশ্চয়ই,' নীরদ তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে। 'ঠাণ্ডাটা কমুক, শীতকালে এমনি তো, আমরা যাকে বলি সুস্থলোক কাবু হয়ে পড়ি,—ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকে না হোক, মাঝামাঝি, শেষদিকে তো বটেই—হাঁটতে না পারলেও তুমি উঠে বসতে পারবে। সুধাংশু কাল আমায় বলছিল। তারপর তো সামার—গ্রীষ্মকাল, প্রচুর রৌদ্র, প্রচুর হাওয়া, মানুষের হাত-পা তখন আপনা থেকে সজীব হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে—সুধাংশু বলে, বাবু সে-সময় হাঁটবেই, তাছাড়া এখন যখন একটা নতুন ইঞ্জেক্‌শান দেওয়া হচ্ছে। আর ভয় নেই।' কথা শেষ করে নীরদ হেসেছে। বাবু হাসে নি। বড়-বড় চোখ দুটো মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে কি ও বুঝতে পেরেছিল, নীরদ চিন্তা করে। ফাল্গুন গেছে, চৈত্র গেছে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়ও এসে গেল। যেমন ছিল তেমনি আছে। উঠে বসবার আগে হাঁটু দুটো তো গুটোতে পারা চাই, কিন্তু সেই শক্তি বাবুর কোথায়। হ্যাঁ, ও বুঝতে পেরেছিল বলেই বাবার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল। তিন বছর শুয়ে আছে, তিন মাসের মধ্যে এমন কিছু তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হবে না যে,—

কিন্তু তবু নীরদকে বলতে হয়েছিল, বলতে হচ্ছে। সে নিজেই

যদি আশার আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকে তো ঐটুকুন ছেলে, —'তার শরীরে তুমি বল যোগাতে না পার মনোবল তো ভেঙে দিতে পার না। সেই অধিকার তোমার নেই,—আমার নেই,'—চিন্তা করে নীরদ পরশুদিন আবার ছেলের জন্য নতুন একসেট জামাকাপড় কিনে নিয়ে গেল।

আজ ভোরে হঠাৎ ছেলের কথা শুনে নীরদের মন খারাপ হয়ে গেছে। এমন নয় যে তখনকার মতন খারাপ হয়েছিল,—চটপট তার প্রতিবিধান করে মনটা চাঙ্গা করতে পেরেছে। হ্যাঁ, প্রায় তিন মাস আগের কথা। নীরদ অবাক হয়, কী করে নিজে সে ভুলে আছে বলে নয়, বাবু ভুলে না-গিয়েও কথাটা কেমন করে চেপে আছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর একদিনও বাবাকে সে বলল না কেন ভেবে। 'কেন বলে নি ?' একটা সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা নীরদের দুই ভুরুর মাঝখানে সেই সকাল থেকে ঝুলে আছে। জিজ্ঞাসার সঙ্গে অনুশোচনা, চাপা একটা বেদনা বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখে সে আজ সারাদিন চলাফেরা করেছে, কাজকর্ম করেছে। একটু-একটু করে ব্যথাটা বড় হয়ে এখন বিবর্ণ ধূসর দিনের শেষে অফিসের প্রায়ান্ধকার এই নির্জন কামরায় নীরদকে বড় বেশি পীড়িত করে তুলল। রুমালের কোণা দিয়ে আর একবার সে চোখ মুছল। বাইরে যাওয়া। বাবুকে নিয়ে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে মাস দু-তিন থাকা! 'তুমি কি অফিসে ছুটি পাচ্ছ না, বাবা ?' প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নীরদ শুধু ঘাড় নেড়েছে। মুখে কিছু বলে নি। কী বলবে ? 'কে !'

পুস্-ডোর নড়ে উঠতে নীরদ চমকে উঠল, তারপর সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, 'আই সী।'

মিস্ ভৌমিক। রাণু ভৌমিক টেবিলের ওপর হাতের থলেটা

রেখে উলটো দিকের একটা চেয়ারে বসল। 'চুপচাপ বসে আছেন।'

'শরীরটা ভালো না।' নীরদ হাই তোলার ভঙ্গিতে একটু বড় করে হাসল, 'আপনি এখনও অফিসে?'

রাণু ভৌমিক হাসল না। মুখখানা গম্ভীর করে আস্তে-আস্তে বলল, 'আমার মনটা ভালো না মিস্টার সান্যাল।

অফিসের চ্যাটার্জি-সাহেবের স্টেনোগ্রাফার। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তবে দেহ এখনও আঁটসাট। পুরুষের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল। রুজ-পাউডারের প্রলেপমণ্ডিত মুখখানা দেখলে ত্রিশের কাছাকাছি বয়স বলে কেউ-কেউ ভুল করতে পারে মিস ভৌমিককে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে গলার চামড়ার একটি-দুটি ভাঁজ এবং কপালের দুটো-একটা রেখা চোখে পড়ে। তখন আর বয়স সম্পর্কে ভ্রম হয় না। তাছাড়া চোখের নিচের পাড় একটু-একটু করে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, প্রসাধন দিয়ে রাণু ভৌমিক তা কিছুতেই ঢাকতে পারছে না।

'কেন হঠাৎ মন খারাপ?' নীরদ প্রশ্ন করল, 'চ্যাটার্জি-সাহেব রওনা হয়ে গেছেন?' ইচ্ছা করেই নীরদ এটা যোগ করল, এবং রাণুর চোখ পরীক্ষা করতে লাগল।

'চ্যাটার্জি চলে গেছে বলে মন খারাপ বলতে চান?' রাণু নীরদের চোখ দেখল। 'তা বলতে পারেন, লিফ্‌টে মিঃ ঘোষালের সঙ্গে দেখা, তিনিও তাই বললেন, সবাই বলবে, অফিসের বেয়ারা দারোয়ানরাও বলবে চ্যাটার্জি একমাসের জন্য সিঙ্গাপুর অফিসে চলে গেছে, রাণু ভৌমিক পৃথিবী অন্ধকার দেখছে।'

নীরদ ক্ষীণ শব্দ করে হাসল। 'প্লিজ এক্স্‌কিউজ মি, হ্যাভ এ স্মোক, মিস ভৌমিক।' নীরদ সিগারেটের টিনটা সামনের দিকে

বাড়িয়ে দেয়। রাণু একটা সিগারেট তুলে নেয়। নীরদ লাইটার জ্বেলে রাণুর সিগারেট ধরিয়ে দেয়। 'ধন্যবাদ।' বলে রাণু আবার চুপ করে থাকে। হঠাৎ মনে হতে হাত বাড়িয়ে নীরদ সুইচটা টিপে দেয়। ঘরের বিমর্ষ অন্ধকার দূর হয়ে আলোর বন্যায় চারদিক হেসে ওঠে। কিন্তু নীরদ দেখে চমকে উঠল রাণুর চোখের কোণায় একফোঁটা জল মুক্তা হয়ে টলমল করছে।

'কী ব্যাপার?' প্রশ্ন করতে গিয়ে নীরদের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। হা করে শুধু তাকিয়ে রইল।

আর একটু সময় কাটে। তারপর সিগারেটের ছাই ঝাড়বার অছিলায় রাণু টেবিলের অ্যাসট্রের উপর ঝুঁকে পড়ে নীরদের দিকে গলা বাড়িয়ে দেয়। জলের ফোঁটাটা টুপ করে টেবিলের বনাতের ওপর ঝরে পড়ল।

'ট্রু লভ—প্রকৃত ভালোবাসার কোনো মূল্য আছে আপনি বিশ্বাস করেন মিস্টার সান্যাল?'

'হঠাৎ এ-প্রশ্ন?' নীরদ হাসি চাপতে ঠোঁট টিপল।

'না, এমনি, মনে হল তাই জিজ্ঞেস করলাম।' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর রাণুর, কিন্তু ভারি মিষ্টি শোনাল।

নীরদ চুপ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে রাণু সোজা হয়ে বসল। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা নিজের মনে জ্বলছে। আনত চক্ষুপল্লব। যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করছে।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন নীরদ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি কি এয়ারোড্রোম পর্যন্ত গিয়েছিলেন, মানে চ্যাটার্জি-সাহেবকে সী অফ্ করতে?'

'হ্যাঁ, এই তো ফিরলাম দমদম থেকে।' হাতঘড়ি দেখল রাণু

ভৌমিক। 'আধঘণ্টা আগে আমি ফিরেছি। অফিসে ফেরার ইচ্ছা ছিল না। কাজ নেই কিছু। কিন্তু কোথাও আর যেতে ইচ্ছা হল না।'

তাই এলাম আবার কাচের বেড়াঘেরা চ্যাটার্জি-সাহেবের শূন্য কামরায়। যেখানে অনেক স্মৃতি অনেক রঙ এখনও জ্বলজ্বল করছে। চিন্তা করে মনে মনে হাসল নীরদ। কিন্তু মুখ বুজে রইল।

'আমার কার্টেসি আমার কাছে, আমি তো অভদ্র হতে পারি না! কাজেই দমদম পর্যন্ত ছুটে গেলাম।'

নীরদ বুঝল আঘাত কোনদিক থেকে এসেছে। কিন্তু সাহস করে কিছু প্রশ্ন করতে পারল না।

'আমি অবাক হয়ে গেছি, লোকটার ডুপ্লিসিটি দেখে, আগে তা বুঝি নি, এখন বুঝছি, আজ বুঝলাম, দমদম যাওয়ার পথে গাড়িতে বসে ওর কনফেশান শুনতে হল।' উত্তেজনায় রাণু ভৌমিকের শরীর কাঁপছে, নীরদ অনুমান করল। 'কাওয়ার্ড কাওয়ার্ড,—চ্যাটার্জি যে এত ভীরু এত মীন্ আমি কি জানতাম মিস্টার সান্যাল।' চোখের কোণায় আবার জল মুক্তা হয়ে টলমল করে। রাণু ভৌমিক এবার বাঁ-হাতের ছোট্ট রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ফেলল।

'কি ব্যাপার বলুন তো!' নীরদ খুব অবাক হল না তবু অবাক হবার ভান করে ভুরু কুঁচকোল। 'কাল তো বোম্বে থেকে টেলিগ্রাম এল, সিঙ্গাপুর অফিসের কাজে গণ্ডগোল হয়েছে, চ্যাটার্জি-সাহেবকে আজ পাঁচটার প্লেনে স্টার্ট করতে হচ্ছে। তাই না?'

'তাই।' একটু অতিরিক্ত ঝাঁকুনি দিয়ে রাণু ভৌমিক ঘাড় নাড়ল। 'সিঙ্গাপুরের অফিসে গণ্ডগোল হচ্ছে কিনা জানি না, তবে চ্যাটার্জি ইচ্ছা করে একমাসের জন্য এখান থেকে সরে পড়ল।'

নীরদ চোখ গোল করে রাণু ভৌমিককে দেখে। পরে আস্তে আস্তে বলে, 'আমি যে টেলিগ্রাম দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি।' রাণু ভৌমিক এবার লাল ঠোঁট সরু করে সিগারেট টানে। 'চ্যাটার্জি কাল খাম খুলে প্রথম আমাকে দেখিয়েছিল।'

'তবে আর কি।' নীরদ সান্ত্বনার সুরে বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বলতে না পেরে ঠোঁট দুটো নাড়ে।

'টেলিগ্রাম-ফেলিগ্রাম ছেড়ে দিন মিস্টার সান্যাল,—ওর কনফেশান, গাড়িতে বসে নিজের মুখে আমাকে যা বলল তাই সত্য,—এবং কথাগুলো বিশ্বাস না-করারও কোনো কারণ দেখছি না।'

'কি?'

'আমি তার ফ্যামিলি-লাইফ নষ্ট করে দিচ্ছি, আমি—'

'অ্যাদ্দিন পর এ-কথা!' নীরদ এবার সত্যি অবাক হল।

'আমায় শেষ করতে দিন সান্যাল। আপনাকে কথাগুলো বলতে আমি দমদম থেকে ছুটে আবার অফিসে ঢুকেছি। এখানে যদি কেউ সোবার লোক থাকে—আপনি, আপনি উইডোয়ার, একটি মেয়ের দুঃখ আপনি—'

'ঠিক আছে, আপনি বলুন।' নিজের প্রশংসা শুনতে নীরদের চিরদিন সংকোচ। 'হ্যাঁ—চ্যাটার্জি বলল এ-কথা!'

'তাঁর স্ত্রী, সে চাইছে না আমার সঙ্গে চ্যাটার্জির মাখামাখি—'

'মাই গড্—তিনি কি করে—'

'দেখেছে, সেদিন চ্যাটার্জি তার মিসেসের সঙ্গে ইনট্রডিউস করিয়ে দেবে বলে একটা হোটেলে আমাকে নেমন্তন্ন করল—'

'কেন তা করতে গেল।' নীরদ গলার একটা শব্দ করে বিড়বিড় করে উঠল, 'ফুল্।'

'বাহাদুরি দেখুন না, আমি তো ভাবলাম স্ত্রী তার কন্ট্রোলের মধ্যে আছে, না হলে আমি তার স্টেনো, কিন্তু বাইরে তো বান্ধবী,—

স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষ বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দেয়, বিশেষ আমাদের সমাজে—যার সাহস আছে, স্ত্রীকে যে শাড়ি-গয়না দিয়ে হোক চোখ রাঙিয়ে বা সত্যিকারের পৌরুষ দিয়ে মুঠোর মধ্যে রেখেচে, রাখতে পেরেছে, তারই এসব সাজে। যাকগে—আমি তো ভাবলাম মিসেসকে দিয়ে চ্যাটার্জির এক ফোঁটা ভয় নেই, আর চ্যাটার্জির স্ত্রীও আমার সঙ্গে বেশ ভালো করে কথাবার্তা বলল তখন, চ্যাটার্জি মদ খেল, আমিও একটু শেরি চাখলাম—চ্যাটার্জির বৌ একটা ভিমটো খেল—'

'তারপর ?'

'তারপর হয়ে গেল—' রাণু ভৌমিক রুমাল দিয়ে কপাল মুছল। 'বাড়ি গিয়ে বৌ নাকি ভীষণ লাফালাফি করেছে, কাঁদাকাটি করেছে, আর চ্যাটার্জিকে শাসিয়েছে যদি আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ না করে তবে সুইসাইড করবে।'

নীরদ গম্ভীর হয়ে রইল।

'ঐ তো দেখলাম কালীঠাকরুণের মতো চেহারা; আমার তো এমন গা-বমি করছিল দেখে—থুঃ—' যেন থুথু ফেলতে রাণু ভৌমিক এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে পরে সুবিধামতো পাত্রটাত্র না পেয়ে অগত্যা সেটা গলাধঃকরণ করে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছল।

'আজ কি বলছিল চ্যাটার্জি ?'

'বাড়িতে আজ পনেরো দিন ধরে ভীষণ অশান্তি যাচ্ছে—কিছুতেই তিষ্ঠোতে পারছে না, আপাতত সিঙ্গাপুর গিয়ে একমাস থাকবে,—চাকরি তো আর ছাড়তে পারে না, সেখানে গিয়ে লেখা-লেখি করে বোম্বে মানে হেড-অফিসে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যেতে পারে কিনা তার চেষ্টা করবে।'

'ফ্যামিলি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস্টার সান্যাল,' রাণু ভৌমিকের চোখ দুটো অসম্ভব চকচক করছিল, ছোট ফাঁপানো চুলে সাংঘাতিক রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'পরিবারের জন্যেই তো এতসব কাণ্ড—আমার সঙ্গে আর মিশতে না হয় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাই মানে-মানে এখান থেকে সরে পড়ল—ছেলে ও বৌকে আপাতত বালিগঞ্জে শালার বাড়িতে রেখে গেছে—পরে সুবিধে মতন নিয়ে যাবে—'

এরপর কী বলা যায় নীরদ চিন্তা করছিল।

রাণু ভৌমিক বলল, 'এর আগে ঐ যে দিন কতক এই অফিসে ছিল, কি নাম, আপনি দেখেছেন—'

'বোস ?' নীরদ বলল, 'অরুণ বোস—'

রাণু ভৌমিক মাথা নাড়ল, 'দিল্লী অফিস থেকে এসেছিল। চমৎকার হার্ট লোকটার—কি, আপনার কাছে বলতে আমার সংকোচ নেই,—অরুণ আমার দিকে ঝুঁকেছিল, একটু বেশিই ঝুঁকেছিল,—মাত্র কয়েকদিনের তো পরিচয়—কিন্তু চ্যাটার্জির চোখে তা ভালো লাগে নি,—একদিন তো আমাকে পষ্টাপষ্টি বলেই দিলে—'

'আপনি শুনলেন চ্যাটার্জির কথা ?'

'না শুনে করব কি—অরুণ এই অফিসের টেম্পোরেরি হ্যাণ্ড, গেল এক কথা, দু-নম্বর আমি চ্যাটার্জির স্টেনো,—কিন্তু আমি কি জানি, আমি কি জানতাম চ্যাটার্জি শেষপর্যন্ত এমন করবে—কাওয়ার্ড মীন্—উঃ—'

আর-একটু সময় কাটে। নীরদ হাতঘড়ি দেখে। রাণু ভৌমিক নীরব আনতমুখী। টুপ করে আর একফোঁটা জল টেবিলের ওপর ঝরে পড়ল। সান্ত্বনা দিতে নীরদকে মুখ খুলতে হল, 'তা চ্যাটার্জি যখন নিজে থেকে সরে পড়েছে, একরকম মন্দ হল কি মিস ভৌমিক, —আপনি এখন স্বাধীনভাবে—'

নীরদের কথা অসমাপ্ত থেকে গেল। একটা বিস্ফোরণের মতো হঠাৎ রাণু ভৌমিকের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল, 'হোয়াট!' ওর চেহারা দেখে নীরদ ভয় পেল। 'আমার ভালোবাসার কোনো দাম নেই—অ্যাঁ, আমি, আমি কি একটা—উঃ—তবে আজ আপনাকে বলছি সান্যাল, আয়ার-সাহেব আমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল, হ্যাঁ, আপনাদের চীফ একাউন্টেন্ট, সারাদিন তো মুখখানা এমন গোমরা করে আছে, দেখলে মনে হয় না টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু তার পছন্দ—আয়ারের এক ডজন চিঠি আপনাকে দেখাতে পারি—'

'তারপর?' ফ্যালফ্যাল করে নীরদ রাণু ভৌমিকের মুখ দেখে।

'তারপর আর কি,' রাণু ভৌমিক দাঁতে দাঁত ঘষল, 'দ্যাট্ স্কাউণ্ড্রেল, দ্যাট্ চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করল, হ্যাঁ, পর্যন্ত অফিসের কাজ নিয়ে একটা চিঠি সাতবার করে টাইপ করিয়েও তাতে ভুল বার করবার জন্যে ও উঠে পড়ে লেগে গেল।'

নীরদ এবার ক্ষীণ গলায় হাসল।

'আপনি হাসছেন,' রাণু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে আর্ত অসহায়ের মতো নীরদের চোখের দিকে তাকায়, 'তারপর, কেন, আপনাদের চক্রবর্তী-সাহেব কি,—এমনি তো আমার মেয়ে আমার ছেলে আমার ওয়াইফ ছাড়া অফিসে কারো সঙ্গে কথাই বলেন না, তিনি আমার সঙ্গে ভাব করতে চান নি? একদিন? কমসে-কম আট দিন আমার বৌবাজারের বাসায় গাড়ি নিয়ে গেছেন, 'সিনেমায় চল মিস ভৌমিক, নয়তো এসো কোথাও খাব একসঙ্গে দুজন।'

'গেলেন, গিয়েছিলেন এক-আধদিন ?' আর সংকোচ করা বৃথা মনে করে নীরদ সরাসরি প্রশ্ন করল।

রাণু ভৌমিক ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল, যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, অনুচ্চ রুদ্ধ গলায় উত্তর দিল, 'না যাই নি, সাহস পাই নি চক্রবর্তীর সঙ্গে হোটেলে সিনেমায় বেরোতে, চ্যাটার্জির সঙ্গে তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি—' রাণু ভৌমিক একবার থামল, তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল, 'এমনভাবে ও আমার সর্বনাশ করল, আমার সকল দিক নষ্ট করে সবায়ের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার সর্বস্ব লুঠ করে স্কাউণ্ড্রেল আজ সরে পড়ল ও-হো-হো—'

নীরদ অপ্রস্তুত। 'ছি, আস্তে, মিস ভৌমিক, বেয়ারা দারোয়ানরা এখনো ঘোরাঘুরি করছে—শুনুন—'

কান্নার শব্দ রুদ্ধ হল, কিন্তু কান্না থামল না। গালে-চোখে জল নিয়ে রাণু ভৌমিক মুখ তুলল, 'আপনি কী বলছেন, আমায় এমন-ভাবে যে চিট করল আমি তার প্রতিশোধ নেব না! আমি কি একটা ইয়ে, আমার ভালোবাসার কি কোনো দাম নেই—বলুন।' নীরদ হতভম্ব, এবার রাণু ভৌমিকের প্রত্যেকটা কথা তীরের মতো এসে তার বুকে বিঁধছে। যেন যন্ত্রণায় তার মুখ নীল হয়ে গেল।

চার

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী স্কোয়ারের মোড়ে একটা চীনা রেষ্টুরেণ্টে দুই বন্ধু ঢুকে পড়ল। পরিচিত জায়গা। বয়-রা বাবু দুটিকে চেনে। কোণার দিকের পার্টিশান-ঘেরা ছোট কামরাটি সুধাংশুর প্রিয়। সেদিকে সে অঙ্গুলিনির্দেশ করা মাত্র মজিদ নামক অল্পবয়স্ক পরিচারকটি মাথা নেড়ে বলল, 'হুজুর, খালি আছে, চলুন।' সুধাংশু চোখের ইঙ্গিত করতে নীরদ তাকে অনুসরণ করল।

চটপটে হাতে মজিদ আলো জ্বেলে দিল, পাখা খুলে দিল, তারপর ফুল-পাতা-আঁকা সুদৃশ্য একটা ঢাকনা টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাবুদের মুখ পরীক্ষা করতে লাগল। 'ইদিকে এসো,' সুধাংশু নীরদকে ডাকল। মুখোমুখি না বসে দুজন পাশাপাশি বসল। রুমাল দিয়ে সুধাংশু কপালের ঘাম মুছল, নীরদ রুমাল দিয়ে ঘাড় ও গলাটা বেশি করে মুছল।

সুধাংশু আড়চোখে নীরদের দিকে তাকায়, 'হুইস্কি ?'

নীরদ মাথা নাড়ল।

'রাম্ ?'

নীরদ মাথা নাড়ল।

'ব্র্যাণ্ডি ?' সুধাংশু ফের প্রশ্ন করল।

নীরদ মাথা নেড়ে বলল, 'ন্—নাঃ—আমাকে ঐ একটা বিয়ার-ফিয়ার দিতে বল—শরীরটা তেমন ভালো নেই।'

সুধাংশু ভুরু কুঁচকোল। 'স্ট্রেঞ্জ—কেন বিয়ার খাওয়ার কি হয়েছে, শরীর খারাপ অর্থ কি। ও কিচ্ছু না, ডাল্ ওয়েদার,—আমারও তো শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।' সুধাংশু ঘাড় তুলে

মজিদের দিকে তাকাল। 'হুইস্কি।' ঘাড় নেড়ে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং দু-মিনিট পর গ্লাস, সোডা ও মদের বোতল নিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল।

দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে সোডার বোতলের ছিপি খুলে দিয়ে মজিদ আবার বাবুদের মুখ পরীক্ষা করে।

'কিছু খাবে?' সুধাংশু বন্ধুর দিকে তাকায়।

নীরদ মাথা নাড়ে। 'কি দরকার, একটু চানা-টানা বলে দাও।'

কিন্তু সুধাংশু তা শোনে না। বয়কে কি যেন বলে।

বয় ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়।

সুধাংশু সিগারেট ধরাল। নীরদ সিগারেট না ধরিয়ে দু-আঙ্গুলের মধ্যে সেটা গুঁজে রেখে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। রাশি-রাশি চেরিফুল ফুটেছে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে একটি মেয়ে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাসছে। জাপানী তরুণী।

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নীরদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকাতে সুধাংশু প্রশ্ন করল, 'খুব একটা চিন্তা করছ কিছু মনে হচ্ছে।'

'মনটা ভালো নেই।' নীরদ সিগারেট ধরাল। তারপর সুধাংশুর দেখাদেখি গ্লাস তুলে একটা চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে সিগারেট টানতে লাগল।

'মন ভালো না ভালো না সর্বদাই বলছ। কিন্তু আমি তো আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছি না,—অবশ্য তোমার মন খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক—' চোখ বুজে একটু চিন্তা করে সুধাংশু পরে বলল, 'তা তুমি যদি বল আমি আবার কোন স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করতে পারি,—কিন্তু—'

'তাতে কিছু লাভ নেই,' নীরদ ঘাড় নাড়ল, ঘাড় নেড়ে মদের

গ্লাসে চুমুক দিল, 'একজনকে তো আর দেখান হয়নি, তিন-তিনটে স্পেশালিস্টকে দেখান হয়েছে, এবং তাদের—'

'সবাই একরকম রায় দিয়েছে, এই তোমার ছেলের ডিজিজ, এই তার ট্রিটমেন্ট,—কাজেই—' সুধাংশু কথা শেষ না করে মৃদু হেসে ইঙ্গিতে বক্তব্য সম্পন্ন করল।

বয় খাবার নিয়ে এল।

'যাও, পিছু বুলায়েঙ্গে।' নীরদ হঠাৎ হিন্দী বলতে চেষ্টা করল।

মজিদ অল্প হেসে ঘাড় নেড়ে সরে গেল।

'কাজেই মন খারাপ করে লাভ নেই।' সুধাংশু বলল, 'আর কি খবর বল,—ওটি কে হে, চোখ মুছতে মুছতে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে গেল ?'

'মিস ভৌমিক—আমাদের অফিসের চ্যাটার্জির স্টেনো।' নীরদ গম্ভীর থেকে কাঁটা-চামচ বাগিয়ে মাংসের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'বাঙালী, আমি তো ভাবলাম অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুঝি।' সুধাংশু গরম মাংস ছিঁড়ে মুখে পুরল।

'কি হয়েছে, খুব যেন কাঁদাকাটা করছিল। চাকরি গেছে ?'

নীরদ কথা বলল না।

'তা ওদের চাকরি গেলেও আবার চট্ করে জুটে যায়—ওদের চাকরির অভাব হয় না।'

'কেন,—এ-কথা বলছ কেন ?'

প্রশ্ন করার সময় নীরদ হঠাৎ চোখমুখের এমন ভঙ্গি করল যে সুধাংশু চমকে উঠল। সুধাংশু অবশ্য সরলভাবেই কথাটা বলছিল কিন্তু নীরদের রুক্ষ স্বর তার ভালো লাগল না। তাই ইচ্ছা করে 'শর্টহ্যাণ্ড জানা আছে—অফিসে কাজ পেতে কষ্ট হবে না' না বলে মোটা গলায় বলল, 'ককেট,—এমন চুল-কাটা আর অমন পেট-কাটা

ব্লাউস-গায়ে মেয়েগুলো ওভারনাইট চাকরি যোগাড় করতে পারে।' সুধাংশু গ্লাস তুলে লম্বা চুমুক দিল। গ্লাস নামিয়ে রেখে হা-হা করে হাসতে লাগল।

'হেসো না, প্লিজ ডোণ্ট লাফ্।' নীরদ রাগ করে ছুঁড়ে ফেলার মতন হাতের কাঁটা-চামচ রেখে দিল। 'মিস্ ভৌমিক বিশেষ ধরনের ব্লাউজ গায়ে দিতে পারে, কিন্তু তার সম্পর্কে এরকম ধারণা করবে না।'

সুধাংশু নাছোড়বান্দা। 'আমি জানি অফিস-পাড়ার ওসব মেয়েদের।' সুধাংশু এবার মদের গ্লাসের আড়ালে মিটিমিটি হাসে।

'ননসেন্স।' নীরদ প্রথমটায় বিড়বিড় করে, তারপর আর এক ঢোক গিলে চোখ বড় করে বন্ধুর দিকে তাকায়। 'একটা কথা বলি, রাগ কর না, অফিস বা অফিস-পাড়া সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়া নেই। বাপের টাকায় ডাক্তারী পড়ে পাশ করেছ, বড়লোক শ্বশুরের টাকায় ডিস্পেন্সারী খুলেছ—কাজেই যাদের জান না, যাদের সঙ্গে কথা বলার মেশার সুযোগ হয় নি তোমার, তাদের সম্পর্কে একটু সাবধানে কথা বলবে।'

কিন্তু সুধাংশু তথাপি, বিশেষ নীরদ ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে লক্ষ্য করে, মাথাটা আরো জোরে নেড়ে-নেড়ে মিটিমিটি হাসে, 'এ ককেট—'

'ইউ শাট্-আপ্।' নীরদ চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু সুধাংশু নির্বিকার, নিরুত্তেজ। শূন্য গ্লাস দুটো লক্ষ্য করে গম্ভীর গলায় ডাকল, 'ব-য়,'—তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পরে ডাকল, 'মজিদ—'

মজিদ ছুটে আসতে সুধাংশু বলল, 'পেগ লে আও।' তারপর বন্ধুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে, 'বসো, বসো, অত উত্তেজিত হবার কি

আছে। আমি যদি বলি তার সাজপোশাক, শরীর, হাঁটা এবং চাউনি বলছিল মেয়েটা ভালো নয়,—তো আমার দোষ হবে কি,—আমার যা ইম্‌প্রেশান হল তোমার মিস্‌ ভৌমিককে তখন দেখে—

'ভা-লো না—' যেন আর তর্ক করা বৃথা, এই নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে কিছু বোঝাতে যাওয়া অর্থহীন, মুখের এমন ভাব করে নীরদ আস্তে-আস্তে চেয়ারে বসে পড়ল। ইতিমধ্যে মজিদ বোতল নিয়ে এল, দুটো গ্লাসে পেগ্‌ ঢালা হল, নতুন সোডার বোতল খোলা হল, কিন্তু নীরদ মাথা তুলল না। দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল। হঠাৎ এই পরিবর্তন সুধাংশুর কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকল। 'এই নীরদ, নাও ভাই,—চট্‌ করে এটা শেষ করে চল উঠি।' নীরদের পিঠে হাত রাখল সুধাংশু। 'রিয়্যালি, আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে কিছু বলি নি। তুমি তর্ক করলে আমি তাই—' কিন্তু নীরদ নিরুত্তর। পাশের কোন কামরায় একটা মেয়ে খিলখিল হাসছে। একটি পুরুষকণ্ঠ মোটা গলায় গাইছে : You loved me until morning—And I hate to see you go -o-o- !!'

উত্তেজনার পর অবসাদ,—নীরদের অবস্থাটা তাই দাঁড়িয়েছে কিনা সুধাংশু চিন্তা করল। কিন্তু তেমন নেশা হবার মতন তো খাওয়া হয় নি,—তাছাড়া নীরদ আজ এই প্রথম সুধাংশুর সঙ্গে মদ খেতে আসে নি! যখনই খাওয়ার ইচ্ছা হয় দুজন একসঙ্গে দোকানে আসে। সে তো আজ কতদিন হয়ে গেল। রোজ খাওয়ার পক্ষপাতী তারা কেউ নয়। দু-বন্ধুর মধ্যে এমন কথা হয়ে আছে একজন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখা গেলে আর-একজন তৎক্ষণাৎ রাশ টেনে ধরবে। ভদ্রলোকের মতন খাবে, ভদ্রলোকের মতন বেরিয়ে যাবে। মন খারাপ—আচ্ছা চলো, শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে—আচ্ছা চলো,—একসঙ্গে বসে

দুজনে মন খুলে দুটো কথাও বলা যাবে, সময়টা কাটবে—এই, এর অতিরিক্ত কিছু তাদের ইচ্ছা নেই, রুচিও হয় না। আজ গোড়া থেকে নীরদকে যেন কেমন-একটু অস্বাভাবিক ঠেকছিল, সুধাংশু চিন্তা করল,—'তবে কি,'—সুধাংশু আড়চোখে নীরদকে দেখল, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল তাই বা হবে কি করে, তাছাড়া এটা সুধাংশু কখনই ভাবতে রাজী নয় নীরদ এখানে আসার আগে কোথাও এক-আধটু খেয়ে-টেয়ে এসেছে। সুধাংশু বাইরে খুব চাপা—বেশি কথা বলা বেশি হাসা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সেই জন্যই ওপর থেকে দেখলে সুধাংশুকে 'নিরামিষ' 'নিরামিষ' মনে হয়। কিন্তু আসলে মানুষটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান চতুর এবং হুঁশিয়ার। সেই তুলনায় নীরদ কতকটা মোটাবুদ্ধির লোক এবং সেই কারণেই হয়তো একটু সরল, ভাবপ্রবণ। মাঝখানে দু-বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। বেশি না—বছর চার-পাঁচ। নীরদ চাকরি নিয়ে কানপুর চলে যায়। তাছাড়া বলতে গেলে দুজন একসঙ্গে জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়ে এসেছে। সুধাংশু সাঁইত্রিশে পা দিয়েছে, নীরদের তাই হবে—বড়জোর সুধাংশুর চেয়ে এক-আধ বছরের বড় হতে পারে। টালিগঞ্জে থেকে দুজন বড় হয়েছে। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়ত। পরে অবশ্য সুধাংশু ডাক্তারী পড়ল, নীরদ পড়ল কমার্স। সুধাংশুর বাবা ছিলেন পি-এম-জি অফিসের মস্তবড় চাকুরে। টালিগঞ্জে জায়গা কিনে বড়সড় একখানা বাড়ি করে যেতে পেরেছেন। তিন বৎসর আগে তিনি পরলোকগত হয়েছেন। সুধাংশু টালিগঞ্জ থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে তার ডিস্‌পেন্সারীতে এসে বসে। ডিস্‌পেন্সারীর বাড়িটা তার এক শ্যালক খুঁজেপেতে বার করে দেয়। গোটা বাড়িটাই সুধাংশুর জিম্মায়। সে লীজ নিয়েছে। নিচেটা নিজের জন্য রেখে ওপরের ফ্ল্যাট দুটো সে ভাড়া

দিয়েছে। নীরদের নিজস্ব কোনো বসতবাটি কলকাতায় নেই। টালিগঞ্জে মামার বাসায় থেকে সে বড় হয়েছে—সেখানে থেকেই লেখাপড়া শেখা। মামা ভাড়া-করা বাড়িতে জীবন কাটিয়ে গেছেন। সামান্য চাকরী করতেন কোন এক মার্চেন্ট অফিসে। শৈশবে নীরদ বাপ-মা হারিয়ে শিলচর না শিলং থেকে চলে এসেছিল মামার আশ্রয়ে,—তার আর কোনো ভাইবোনও নাকি ছিল না। মামার কাছে থাকলেও নীরদ অসহায় অনাথ এই বোধটা সুধাংশুর ছোট-বেলায় যেমন ছিল আজও আছে। সেইজন্যই চিরকাল বন্ধুটির প্রতি তার এত মমতা। নীরদও সুধাংশুকে নিজের ভাইয়ের মতন মনে করে, উঠতে-বসতে সকল ব্যাপারে সুধাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করে। তাছাড়া বড়লোক বলে সুধাংশু একটা আশ্রয়ও বটে। কানপুর থেকে কলকাতায় এসে নীরদ সপরিবারে সুধাংশুর টালিগঞ্জের বাড়িতে উঠেছিল। দু-মাস পর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির ওপরের একটা ফ্ল্যাট খালি হওয়ামাত্র নীরদ সেটা পেয়ে যায়। তারপর তো নীরদের জীবনে কত বড়-বড় বিপদ এল। স্ত্রীর অসুখ, ছেলের অসুখ, স্ত্রীর মৃত্যু—তারপর ছেলের এই অবস্থা। বন্ধু সুধাংশু ছায়ার মত নীরদের সঙ্গে-সঙ্গে আছে। আজ কদিন ধরেই নীরদকে সে একটু অন্যমনস্ক দেখছে। মাঝখানে কদিন দুজনের একসঙ্গে কোথাও বসা হয় নি। বাড়িতে একটু কাজকর্মে ব্যস্ত (সুধাংশুর এক ভাগ্নীর বিয়ে—টালিগঞ্জের বাড়িতে শুভকর্ম হয়েছে) থাকার দরুন সুধাংশু ডিস্‌পেন্সারীতেও খুব কম এসেছে। তা হলেও নীরদ যখন অফিসে বেরোয় কি অফিস থেকে বাড়ি ফেরে দু-চার মিনিটের জন্য যে সুধাংশুর সঙ্গে দেখা হয়নি এমন না, কিন্তু একটা-দুটো কথা —'বাবু আজ কেমন আছে, টেম্পারেচার উঠেছিল কি,' অথবা, 'তোমার ভাগ্নীর বিয়ে কবে, আমায় নেমন্তন্ন করছ বটে, কিন্তু যাওয়া

হবে কি—মনটা ভালো নেই,' ইত্যাদি ছাড়া আর বিশেষ কিছু কথা হয়নি। এবং তখনই সুধাংশু নীরদের অন্যমনস্কতা, কেমন যেন অস্থিরতা লক্ষ্য করেছে। কোনো প্রশ্ন করেনি যদিও। কাল শুভকাজ হয়ে গেছে। আজ সকালেও সুধাংশু ব্যস্ত ছিল। দুপুরে বর-কনে বিদায় করে দিয়ে সুধাংশু অবসর হয়েছে। বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে সোজা সে চলে আসে নীরদের অফিসে। হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে তখন। বাইরে গাড়ি রেখে সুধাংশু বারান্দায় দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট-এর জন্য অপেক্ষা করছে—এমন সময় দুজন, নীরদ আর সেই মেয়েটি একসঙ্গে নিচে নামল,—লাল টুকটুকে একটা রুমাল দিয়ে মেয়েটি মানে নীরদের অফিসের মিস্‌ ভৌমিক চোখ মুছতে-মুছতে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে গেল। সুধাংশু নীরদকে গাড়িতে তুলে এখানে চলে আসে।

'এই নীরদ!' চাপা ধমকের সুরে এবার সুধাংশু বন্ধুকে ডাকল।

নীরদ মুখ তুলল। চোখ লাল হয়েছে। একটু জলও জমেছে চোখের কোণায়।

'ছেলেমানুষি করছ—' সুধাংশু গম্ভীর গলায় বলল, 'কি হয়েছে আমায় বলতে বাধা আছে কি?'

'কিছু হয়নি—' নীরদ মাথা নাড়ল, ক্ষীণ হাসল,—'রিয়্যালি আমিও তর্কের খাতিরে বলছিলাম—না হলে—'

'আমি জানি, আমি জানতাম, মিস্‌ ভৌমিক যা-ই হোক, যে-কারণেই ও কাঁদুক, তোমার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই—থাকতে পারে না।'

'না, নেই।' নীরদ হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলল। 'লাস্ট পেগ, আর খাব না আমি—'

'আমিও আর খাব না।' সুধাংশু হাতে গ্লাস তুলল। 'তবে

এখন মুখ গুঁজে থেকে মন খারাপ করার অর্থ কি। কি হয়েছে ?'

'বলব, বলছি।' গ্লাস রেখে দিয়ে নীরদ সিগারেট ধরাল। 'মিস্ ভৌমিক কাঁদছে চ্যাটার্জি তাকে ফাঁকি দিয়ে সরে গেল। আমাদের অফিসের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সমর চ্যাটার্জি।'

'কোথায় গেল ?'

'সিঙ্গাপুর, প্লেনে তুলে দিয়ে এসে মিস্ ভৌমিক আমায় বলছিল—'

'ফাঁকি দিয়েছে মানে, বিয়ে করার কথা ছিল? তোমাদের সমর চ্যাটার্জি বিয়ে করেনি ?'

'অনেক দিন, ছেলে আছে বড়—' বলতে-বলতে নীরদ আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সুধাংশু বলল, 'নাও, শেষ করে নাও।'

কথা না বলে নীরদ গ্লাস উপুড় করে অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ করল, তারপর সিগারেট টানতে লাগল।

সুধাংশু বয়কে ডেকে বিল আনতে বলল।

'বিয়ে করত কিনা জানি না, তবে চ্যাটার্জি সুখের পায়রাটি হয়ে যতটুকু আনন্দ লুঠবার লুঠে এখন উড়াল দিয়েছে—' নীরদ সুধাংশুর চোখে-চোখে তাকায়।

'এরা সমাজের যতটা ক্ষতি করছে—' সুধাংশু বিড়বিড় করতে-করতে পরে পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমি ডাক্তার,—তাহলেও বলছি টি-বি ক্যান্সার একটা দেশকে জাতিকে অতখানি দুর্বল করে না, পঙ্গু করে না, এরা যতটা করছে—'

'মিস ভৌমিকের দল ?'

'মিস ভৌমিক, তোমার চ্যাটার্জি-সাহেব—আই কান্ট্ ড্রিম—একটা পুরুষ বিয়ে করেছে, সন্তান হয়েছে, রেস্পন্সিবল পোস্ট নিয়ে

এক জায়গায় কাজ করছে—আর সে কিনা—' ঘৃণায় বিদ্বেষে সুধাংশুর চোখমুখ কুঁচকে উঠল, 'একটা মিস ভৌমিক না, একজন চ্যাটার্জি না, এমন বহু চ্যাটার্জি-ভৌমিক সাজপোশাক ভদ্রতা কালচারের খোলস পরে লুকিয়ে-লুকিয়ে সমাজে বিষ ছড়াচ্ছে।' বলতে-বলতে সুধাংশু একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমি, আমার হাতে যদি আইন থাকত, পুলিশ থাকত এগুলোকে আগে গুলি করে মারতাম, জেলে পুরতাম—এদের অপরাধের তুলনায় আমি তো ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার চোর জালিয়াতদের সাধু মনে করি।'

নীরদ কথা বলল না। হা করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পাশের কামরায় এবার নারীকণ্ঠ ককিয়ে উঠল: And I hate to see you go—o—o!'

'ইউ গো টু হেল্।' বলে সুধাংশু উঠে দাঁড়ায়। বয় বিল নিয়ে আসে। পার্স খুলে সুধাংশু টাকা বার করে দেয়। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নীরদকে চেয়ার থেকে টেনে তোলে, 'চল, আর বসে থেকে কাজ নেই।'

গাড়িতে বসে তুজনের কথা হয় না। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নীরদ বসে থাকে। যেন ঘৃণা ও বিরক্তির ভাবটা এখনও সুধাংশু ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। মুখটা শক্ত, দৃষ্টি কঠিন, স্টিয়ারিং ধরে-রাখা হাত তুটো দৃঢ়। এ-সময় সেণ্ট্রাল এভিন্যুতে ট্রাফিকের স্রোত বয়, গোঁ-গোঁ, সোঁ-সোঁ শব্দের ঝড় বইছে। যেন কথা বললেও শুনতে পাওয়া কষ্ট। ধর্মতলার মোড়ে এসে গাড়ি থামিয়ে সুধাংশু ঘাড় ফেরাল এবং প্রথম কথা বলল, 'গঙ্গার ধারে যাব?'

'না।' নীরদ হাতের ভিতর থেকে মুখ তুলল।

'তাহলে মাঠে একটু বসা যাক?'

'না।' নীরদ মাথা নাড়ল। 'তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি এখানে নামব।'

'কেন?'

'আমি ট্রাম ধরব।'

হাসল সুধাংশু।

'তা আগে বললে না কেন?'

নীরদ হাসল না।

সুধাংশু আর কিছু বলল না। না বললেও মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বার করল। কিন্তু নীরদ তা গ্রাহ্য করল না, 'চলি ব্রাদার—' বলে দরজা খুলে নেমে পড়ল। সুধাংশু বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'ট্রামে এখন না-চাপাই ভালো,—বরং একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যাও।'

'তাই যাব, তাই যাওয়া যা—বে—' বলতে-বলতে নীরদ ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

'কিছু একটা হয়েছে ওর।' স্টিয়ারিং-এ হাত রাখতে গিয়ে সুধাংশু চিন্তা করল। অন্যদিন হোটেল-রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে তারা এদিকে চলে আসে। নদীর ধারে যায়, কি ওধারে স্ট্যাণ্ডে গাড়ি রেখে দুজন মাঠে নেমে গিয়ে নিরিবিলি বসে গল্পগুজব করে, সিগারেট খায়। বেশি রাত হয়ে গেলে সুধাংশু আর নীরদকে বাড়ি পৌঁছে দিতে উত্তরদিকে গাড়ি নিয়ে ছোটে না। নীরদই নিষেধ করে। 'তুমি চলে যাও, বৌদি চিন্তা করবে—আমি বরং একটা ট্যাক্সি ডাকি।' 'তাই ডাকো।' সুধাংশু বন্ধুর কাছ থেকে হেসে বিদায় নেয়। কিন্তু আজ ব্যাপারটা অন্যরকম হল। 'কি হয়েছে ওর?' সুধাংশু ভাবতে-ভাবতে গাড়ি চালায়।

আর নীরদ ভাবছে, 'সুধাংশু আমার আবাল্য বন্ধু, একমাত্র বন্ধু,

ওর কাছে সব খুলে বলা কি উচিত ছিল না, নিশ্চয় একটা পরামর্শ দিত। সে নিজে যখন বুদ্ধি ঠিক করতে পারছে না তখন—' ভাবনা হোঁচট খায় নীরদের। সুধাংশুর শক্ত বিকৃত চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। 'ভদ্রতা কালচারের খোলস পরে ওরা সমাজে বিষ ছড়াচ্ছে, আইন আর পুলিশ হাতে থাকলে আমি এদের গুলি করে মারতাম, জেলে পুরতাম।' ভিড়ের ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে নীরদ অগ্রসর হয়। যেন তার নিজের পায়ে জোর নেই। ভিড় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোন্ দিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই। কেবল চোখের ওপর আলোর সারি মানুষের মুখ মাথা দোকান খেলনা জামাকাপড় ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম চামড়ার ব্যাগ বেতের চেয়ার দুলছে, আর একটি মুখ। রবারের পুতুলের মুখ না। সেই মুখের দীর্ঘপল্লব ভ্রু-চোখ কখনও কামনার শিখা হয়ে জ্বলছে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, ঘন গরম নিশ্বাস ঝরছে, কখনও হতাশার মেঘে মুখখানা বিষণ্ণ থমথমে,—ক্লান্ত করুণ চোখ বেয়ে এখনি ধারা নামবে। ভিতরের এক অপরিসীম যন্ত্রণায় নীরদের স্নায়ুগুলো আর্তনাদ করে উঠল। আলোর রাস্তা ছেড়ে সে ডানহাতি অন্ধকার গলিতে ঢুকল।

পাঁচ

দোকান। কিন্তু এক আশ্চর্য জগৎ! কে তাকে এখানে টেনে আনল অন্য সময় সে নিশ্চয় ভাবত। কিন্তু এখন তার সেই ভাবনা মনের ধারে-কাছে নেই দেখে নীরদ অবাকও হল। সারি-সারি বেঞ্চির ওপর কেউ পা তুলে বসে, কেউ পা নামিয়ে বসে। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে গেছে। কারো হাতে কাচের গ্লাস, কারো হাতে মাটির ভাঁড়। টুকরো-টুকরো শালপাতায় রয়েছে আদা ছোলা নুন, কেউ নিয়েছে তেলে-ভাজা, সেদ্ধকরা আলু, কেউ ভাঁড়ে করে ফুল্‌কা মেটুলি-চচ্চড়ি এনেছে। আর হৈ-হৈ চিৎকার। বিচিত্র ধরনের চেহারা, বিচিত্র ধরনের বেশভূষা। লুঙিপরা, পায়জামা-পরা, ধুতি-পরা পেণ্টুলন-পরা। ছেঁড়া তালিমারা জামা আছে, খালি গা আছে, সদ্য পাট-ভাঙা শার্ট-পাঞ্জাবি আছে। একচুমুকে কেউ গ্লাস শেষ করছে, কেউ একটুখানি গিলে ওয়াক্ থুঃ করে মেঝে-বেঞ্চি নোংরা করছে, আবার গিলছে, আবার থুথু ফেলছে। বিকৃত মুখ, প্রসন্ন মুখ। কেউ গল্প করছে, কেউ চুপচাপ ধ্যানমগ্ন ঋষি হয়ে আছে। এক-পা এক-পা করে নীরদ কাউণ্টারের সামনে এগিয়ে গেল। যেন চুরি করছে এমনভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে মানুষগুলোর মুখ দেখল।

‘কি চাই আপনার?’

‘ঐ একটুখানি দিন।’

‘কি দেব?’

‘দিশী মদ।’

'ভালো জ্বালা।' মোটা ভুঁড়ি নাচিয়ে লোকটা হেসে উঠল তারপর মুখ বিকৃত করল। হ্যাঁ, এটা দিশী মদের দোকান বটে, এখানে বিলিতি নেই,—ক-নম্বর চাই আপনার? এক দু তিন? ক-আউন্স? পাইট ওধারে।'

'একনম্বর দিন। পাঁচ আউন্স।' সামনে একটা খালি গ্লাস পেয়ে নীরদ সেটা সামনে বাড়িয়ে দেয়।

'এক টাকা পাঁচ আনা দিন।' মোটা লোকটা এতবড় এক মেজার গ্লাসের মুখে ছাকনি বসিয়ে মদ ঢালে। নীরদ পকেট থেকে টাকা বার করে দেয়।

গ্লাস হাতে নিয়ে একবার সে ভাবল সোডা নেবে কি! শুনেছে এ-জিনিস বড় কড়া, বিশ্রী স্বাদ। কিন্তু ভাবতে-ভাবতে সে সোডার কথা ভুলে গেল। গ্লাস তুলে একটা চুমুক দিল। জিহ্বা পুড়ে যায়, গলা পুড়ে গেল। ভালো। এই আমার দরকার। আর-একটু গিলতে-গিলতে নীরদ ভাবল: গলা আগুন। এই আগুন আমার ভিতরের পাপ পুড়িয়ে দেবে। সেই জন্যই তো এখানে আসা।

'আরে দাদা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন কি, দাঁড়িয়ে মদ খাওয়ার মজা নেই।' পায়জামা-পরা লোকটা নীরদকে ডাকে, 'আসুন, এখানে জায়গা আছে।' নীরদ ডাক শোনে, মানুষটার মুখ দেখে, কিন্তু ওদিকে সরে যায় না। ভাবে,—'আগুন দিয়ে ভিতরটা পুড়িয়ে সোনা করে আজ বাড়ি ফিরব। আর আমি অসামাজিক হয়ে থাকব না। দশজনের একজন। আর গুলি করে আমাকে মারবার, জেলে পুরবার কথা সুধাংশু মুখে আনবে না।'

'মদ খেলে আরো কিছু চাই, হা হা হা।' পিছনে হাসির ধমক তুলে লোকটা সঙ্গীকে বোঝায়। 'বুঝ্‌লি নেপ্‌লা, ওই জিনিস পেটে গেল কি শালা গা মোচড় দিয়ে উঠল, হা হা হা—'। 'ও শালা

পাপকথা আমার কানে দিস না গোপ্‌লা—মাইরি, আমি হাত জোড় করে বলছি, ও-পথে আমি ক-ক্‌-খ-নো নেই।' 'শালা তুই একটা অজবুক, তুই একটা গাধা। হা হা হা—' হাসতে হাসতে সঙ্গীর গায়ে ঢলে পড়ে নেপ্‌লা বলল, 'তবে কি শালা তুই গেরস্থ ঘরের—

লোকটার কথা শেষ হতে না-হতে নীরদ গ্লাসটা উপুড় করে সবটুকু শেষ করল। 'একটু আদা দেখি।' নেপ্‌লা-নামক অল্প বয়সের ছেলেটির শালপাতা থেকে নীরদ আদা-নুন তুলে মুখে পুরল, তারপর গোপ্‌লা-নামক সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতার মতন করে বলল, 'হ্যাঁ, পাপ হল গিয়ে সেসব কাজ, বুঝলে ব্রাদার, লাখ কথার এক কথা, আর সেসব পাপী অসামাজিক জীবকে আমার হাতে আইন থাকলে স্রেফ গুলি করে মারব, জেলখানায় পুরব,— ইচ্ছা হয় পকেটে কড়ি থাকে চলে যাও, চলে যাও—' বলতে-বলতে টলতে-টলতে নীরদ দোকানের চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাস্তায় নামল।

'এই রিক্‌শা!'

'বাবু!'

'চলো।'

'কিধারমে যায়গা?'

'জাহান্নামে—'

যেন কি বুঝতে পেরে ঘাড় নেড়ে রিক্‌শাওয়ালা ছুটে চলল।

'বাবু!'

রিক্‌শা দাঁড়াতে নীরদ চমকে উঠল। এসে গেছে? ধারেকাছে এরা আছে! কলকাতা শহরে এরা কত জায়গায় আছে নীরদ তার খোঁজ রাখে না। দরকার পড়েনি। কিন্তু এখন থেকে দরকার হবে। মিস ভৌমিক, সমর চ্যাটার্জিদের দলে আর আমি নেই। রিক্‌শাওয়ালার পয়সা মিটিয়ে একটা গ্যাসের আলোর তলায় দাঁড়িয়ে

নীরদ ভাবে। এই রাস্তার চেহারাটা আরও অদ্ভুত। উলটো দিকে একটা পান-সিগারেটের দোকান। তাছাড়া আর দোকানপাট নেই। কেবল একটা লোক গুরুগম্ভীর গলায় 'মাংসের ঘুঘ্‌নী' হাঁক ছেড়ে ওধারে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর লোকজন নেই পথে। নীরদের একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। আঙুলে আংটি সোনার বোতাম আর কিছু খুচরো নোট ছাড়া তার কাছে তেমন কিছু মূল্যবান জিনিস নেই। আছে। ঘড়ি। কিন্তু তার-ই বা কত দাম! সে-কথা নয়। অজানা অচেনা পাড়ায় গুণ্ডা-বদমায়েসের হাতে মার খাওয়ার ভয় যেমন আছে, খামকা অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করার আশঙ্কাও কিছু কম কি। নীরদ একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে একসময় সে ভুলে যায়। সোঁ করে মোটরগাড়িটা তার নাকের সামনে দিয়ে ঝড়ো হাওয়া তুলে বেরিয়ে যেতে নীরদ চোখ তুলল। 'স্যার,' মুখের সামনে মুখ এনে বাবরি-চুলওয়ালা একটা লোক ফিসফিসিয়ে উঠল, 'স্কুল গার্ল'। বুকের রক্ত উছলে উঠল নীরদের। 'চল, কোথায় দেখি।' 'বাবু এপাড়ায় নতুন এলেন?' লোকটার কথার উত্তর দিল না নীরদ। তাকে পাশে রেখে হাঁটতে লাগল। চোখ তেরছা করে ও যে নীরদের হাতের ঘড়ি এবং বুকের সোনার বোতামগুলো দু-একবার দেখল নীরদ তাও লক্ষ্য করল। কিন্তু মানুষটা এমন ক্ষীণদেহ, হাত ও পা দুটো এত সরু যে একটা ধাক্কা দিলে সাত হাত ছিটকে পড়বে অনুমান করে নীরদ নিশ্চিন্তমনে হাঁটে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দুজন একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনে কি-একটা গাছ। তাই জায়গাটা আরো অন্ধকার। ডাল-পাতা দরজার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসার কথা মনে পড়ল নীরদের, সামনেটা

গাছে-গাছে এমনি অন্ধকার হয়ে আছে। তবে সেই গাছ আরও উঁচু, বাড়িটাও দোতলা। এত নিচু দালান নয়। লোকটা দেয়ালের গায়ে একটা বেল্ টিপতে ভিতরে একটা খুটখুট আওয়াজ উঠল। যেন চটি পায়ে কে তাড়াতাড়ি দরজার ওপাশে এসে দাঁড়ায়। দপ্ করে চৌকাঠের মাথায় একটা বড় আলো জ্বলে উঠল আর পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেল। একটি রঙ-করা মুখ। শাড়ির চেয়ে বেগুনী শায়াটাই বেশি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, পায়ে চটি। লাল চটি। বেণীটা বুকের ওপর এসে দুলছে। ছোট্ট বেণী। মাথায় গোলাপী রিবন বাঁধা। অল্প বয়সের মেয়েরা যেমন করে বাঁধে। কিন্তু চোখ, চাউনি? নীরদ ঘাড় ফিরিয়ে বাবরি-চুলওয়ালার দিকে তাকায়। নীরদের হাসিখুশি চোখ দেখে লোকটা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কি ইঙ্গিত করতে সে হাত বাড়িয়ে নীরদকে ধরে ফেলল। 'আসুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না, ভিতরে আসুন।' মিষ্টি না না হলেও গলাটা মসৃণ পরিচ্ছন্ন। চৌকাঠ ডিঙোবার সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

ছয়

অনুশোচনা, দুঃখ, রাগ কিছুই হল না নীরদের। বরং রিক্‌শা করে বাড়ি ফেরার পথে নিজের মনে সে হাসল। নেশার চাপটা কমেছে। মাথাটা হালকা লাগছে। হাওয়াটা মিষ্টি। গদির ওপর হেলান দিয়ে বসল সে। সুধাংশুর গাড়ি থেকে কেটে পড়ার পর সবগুলো ঘটনা বিক্ষিপ্ত ছবির মতো তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। যেন এখনি সবগুলো ছবি ঝাপসা ঝাপসা হয়ে আসছে। সেই নেপ্‌লা গোপ্‌লা। কাউন্টারের মোটা ভুঁড়ির লোকটা। তাদের হাসি, তাদের কথা, মুখের বিকৃতি। মুখের কাছে মুখ এনে বাবরি-চুলওয়ালা ক্ষীণকায় মানুষটির ফিসফিসানি। আর? এখনি অস্পষ্ট হয়ে গেছে—মুছে যাচ্ছে রং-করা মুখ। ডলি। 'নামটা বেশ, ডল হলে আরো ভালো লাগত শুনতে, ডাকতে।' নীরদ হেসে বলেছিল।

কিন্তু সে তো গেল।

ঘড়ি-ধরা সময়ের আনন্দ বিলিয়ে, আনন্দ নিয়ে এখন যে সে ঘরে ফিরছে তা কদিনের পুঁজি! না কি কাল আবার যাবে! ভাবতে নীরদের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। ভয় সে অবশ্য খুব বেশি করে না। আনন্দের জের মেটাতে কিছু ইঞ্জেকশন নিতে হয় নেবে। সুধাংশুকে দিয়েই নেবে। শুনে বন্ধু হাসবে। নাকটা একটু কুঁচকাবে কি! তাহলেও অল্প সময়ের জন্য। নীরদ তা গ্রাহ্য করবে না।

'কিন্তু তা তো বুঝলাম।' নীরদ নিজেকে বলল, 'এই তৃপ্তি কদিনের, কতটুকুন এর আয়ু।' ভাবল, 'যেন শিশুকে চাঁদ ধরতে দেওয়ার ছল করে একটা শ্বেতপাথরের থালা তার সামনে বাড়িয়ে দেওয়া, পর্বতের নাম করে উঁই-ঢিপি দেখানো।' নীরদের শরীর মন

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল : 'না না, তা হয় না, যদি হত তবে কি আর—' গাছের অন্ধকারে রিক্শা দাঁড়াতে তড়াক করে সে লাফিয়ে নিচে নামল। সবটা বাড়ি ঘুমোচ্ছে। এই ফ্ল্যাট ওই ফ্ল্যাট। কিন্তু রাত খুব বেশি হয়েছে কি? নীরদ আবার হাতের ঘড়ি দেখল। দশটা পাঁচ। অন্যদিনের চেয়ে তো বেশিই রাত করে ফেলল সে। রিক্শার ভাড়া মিটিয়ে অস্থির দ্রুত পায়ে সে মরা গাছের টব-বসানো সরু গলি পার হয়ে ঘোরানো সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়াল। একবার ওপরের দিকে তাকাল। অন্ধকার করিডোর ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে কি? খুব নিশ্চিন্ত হতে পারল না সে। যেন এইজন্যই নিশ্বাস বন্ধ করে কান খাড়া করে রাখল একটু সময়। পাশের পড়ো ঘরের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট চিঁ-চিঁ শব্দ ভেসে আসতে শুনল নীরদ। ইঁদুর। একবার ভাবল পায়ের জুতো খুলে হাতে নিয়ে সে ওপরে উঠবে কিনা। কিন্তু বাস্তবিক যদি ও কড়ি-ডোরের কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে লুকিয়ে অপেক্ষা করে জুতো হাতে করে উঠছে দেখলে হাসবে। 'এত ভয়! এত ভয় করার কি আছে বলুন, সব ভয় লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে না আমরা এতদূর এগিয়ে এলাম! আর একটু সাহস করুন, পুরুষ আপনি, আপনি যদি ভয় করেন আমার কি হবে বলুন।' নীরদ ঘামছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের গলার ঘাম মুছল। তারপর আর ইতস্তত না করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। কিন্তু তা-ও চোরের মতন, জুতোর শব্দ না হয় এভাবে পা টিপে-টিপে সে ওপরে উঠল। সিঁড়ি শেষ করে চোখ বড় করে সে অন্ধকার প্যাসেজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত দৃষ্টিচালনা করে নিশ্চিন্ত হল। কেউ নেই, কিছু নেই, অস্পষ্ট ধূসর সাদাটে কি কালোমতন কোনো-কিছুর আকৃতি কোথাও অপেক্ষা করছে বলে মনে হল না। এবার নীরদ হতাশ

হল। ফাঁকা অন্ধকার প্যাসেজটার মতন তার বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে উঠল। কেমন যেন তার রাগ হল। শুকনো তেতো-মতন একটা ঢোক গিলে এক-পা এক-পা করে নিজের ঘরের দিকে চলল। কটমট চোখে ডান-দিকের ফ্ল্যাটের একটা বন্ধ দরজার ওপর দ্রুত চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে খানিকটা গরম নিশ্বাস ফেলে কি যেন বিড়বিড় করে উঠল।

'বাবা, তুমি এসেছো ?'

'হ্যাঁ বাবা, হরির মা কোথায় ?'

'মাসি ঘুমোচ্ছে।'

হাত বাড়িয়ে নীরদ সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মেঝের একপাশে হরির-মা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। চোখে আলোর বাড়ি লাগতে যেন ধড়মড় করে উঠে বসল। হাই তুলল একটা।

'রাত হল আজ, দাদাবাবু ?'

'হ্যাঁ, একটা কাজে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল।' নীরদ কাপড় ছাড়তে লাগল ! বাবু ফ্যালফ্যাল করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। হরির মা উঠে দাঁড়ায়।

'উঁ, কেমন যেন একটা ওষুধের গন্ধ পাচ্ছি, দাদাবাবু।'

নীরদ চমকে উঠল। তার মুখের গন্ধ। এত তীব্র গন্ধ নিয়ে সে আর ঘরে ঢোকেনি কোনোদিন। বিব্রত হয়ে চট্ করে ঘুরে দাঁড়ায়। টেবিলটা দেখে। 'কোনো ওষুধের শিশি-টিশি পড়ে গেল কি। যা ইঁদুর সারা বাড়িতে।'

'তাই হবে গো, দাদাবাবু।' বুড়ী আর একটা হাই তুলে টেবিলের দিকে এগোয়।

'থাক, থাক। কাল সকালে দেখা যাবে। এই বেলা তুমি কেটে পড় তো হরির মা,—দাঁড়াও, আমি আলো দিচ্ছি।' নীরদ

চ ট্‌ করে টেবিলের টানা খুলে ছোট টর্চলাইটটা বার করে হরির মার হাতে দেয়। বুড়োমানুষ, রাত্রে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার অসুবিধা দেখে নীরদ ওর জন্য একটা ক্ষুদে টর্চলাইট রেখেছে। বুড়ী ওটা রাত্রে সঙ্গে নিয়ে যায়। সকালে আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

'হাতমুখ ধোয়ার জল রেখেছি ও-ঘরে। ভাত ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এ-ঘরে এনে রাখব?'

'কিছু করতে হবে না তোমাকে—সারাদিন তো করছ—এখন যাও তো—বাড়িতে চিন্তা করছে ওরা হয়তো।'

'বাবু! সোনা আমার, যাই—? কাল সক্কালে চলে আসব—কাক ডাকার সাথে সাথে আমি এসে যাব। তুমি ঘুমোও মণি। বাবা এসে গেল আর চিন্তা কি। যাই?'

বাবু কথা না বলে মাথা নাড়ল।

'দুর্গা! দুর্গা!' বলতে-বলতে বুড়ী বেড়িয়ে গেল। বুড়ী বেরিয়ে যেতে নীরদ স্বস্তিবোধ করল। গায়ের গেঞ্জিটাও খুলে ফেলল। 'খোকা এখনো ঘুমোসনি কেন রে?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবা! তোমার পায়ের শব্দে তো জেগে উঠলাম।'

'ঘুমোও, ওষুধ-টষুধগুলি সব খেয়েছিলে তো?'

হ্যাঁ, বাবা।'

নীরদ আর কথা বলল না। তোয়ালে সাবান নিয়ে পাশের ঘরে চলল। একটা নর্দমা থাকায় ও-ঘরে হাতমুখ ধোবার অসুবিধা নেই। কিন্তু তাহলেও একবার চিন্তা করল সে বালতি মগ ওখান থেকে তুলে এনে প্যাসেজের কলতলায় চলে যাবে কিনা। ঘরে ফিরে রাত্রে নীরদ কলতলায় হাতমুখ ধোয়। মাঝে মাঝে স্নান করে।

কেননা, তখন নটার জল এসে যায়। আজ রাত বেশি হয়ে গেল বলে হরির মা জল তুলে ঘরে এনে রেখেছে। চিন্তা করল বটে, কিন্তু কি ভেবে সে আর কলতলায় গেল না। কলতলার চেহারাটা এবং পাশের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা দুটোর ছবি মনে-মনে আঁকতে-আঁকতে সে হাত-মুখ ধোয়ার কাজ শেষ করে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে চলে এল।

'বাবা!'

'আঃ তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন?' নীরদ মুখ মুছতে মুছতে ছেলের দিকে তাকাল। বাবাকে বিরক্ত হতে দেখে বাবু লজ্জা পেয়েছে বোঝা যায়। চুপ করে রইল।

'কি বলো!' নীরদ গলাটা নরম করল।

'না, বলছিলাম কি তুমি এখন খেয়ে ফেলো। এমনি তো ভাত ঠাণ্ডা হয়ে আছে।'

'থাক, তা নিয়ে তুমি ভাবছ কেন। অতটা সময় জেগে থাকলে কাল আবার শরীর খারাপ করবে। তুমি ঘুমোও তো এখন।'

বাবু এবার অল্প হাসল।

'আজ একবারও গা গরম হয়নি, বাবা।'

'সেরে যাবে। বলছি তো তুমি আস্তে-আস্তে সেরে উঠছ।' নীরদ বিছানার কাছে সরে গিয়ে ছেলের কপালের ওপর হাত রাখল। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঘামটা তো আজ আর তেমন আঠা-আঠা ঠেকছে না। তার মানে শরীরটা ভালো আছে।'

'অফিসে ছুটির কথা বলেছিলে বাবা?'

সারাদিনের যন্ত্রণাটা আবার এখন নীরদের বুকের ভিতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিমর্ষ হয়ে গেল চেহারা। আমতা-আমতা করে সে বলল, 'দেখছি, আজ বড়সাহেব ভয়ঙ্কর ব্যস্ত ছিল। হ্যাঁ,

ছুটি তো আমাকে নিতেই হবে। মাস দু-তিন অন্তত। তিনমাস না-ও দিতে পারে। তবু বলব, ছেলেকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে হচ্ছে।'

বাবু খুব বেশি উৎফুল্ল হল না কেন নীরদ বুঝল। কেননা, তার নিজের কানেই নিজের গলার স্বরটা নিস্তেজ অপ্রসন্ন ঠেকছিল। ছেলের কপালের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে আনল। ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালে প্রতিমার মুখটা দেখল। কিন্তু এক সেকেণ্ডের বেশি না। ফটো থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে ঘুরে দাঁড়ায়।

'তুমি খেয়ে নাও বাবা। ছুটির কথা এখন ভেবে কি হবে।'

নীরদ ছেলের চোখের দিকেও তাকাতে পারল না। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে মুখে বলল, 'তুমি এবার ঘুমোও খোকা।' বলে সে আস্তে-আস্তে পাশের কামরার দিকে চলল।

কামরাটা অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু তা হলেও রান্না-খাওয়া ভাড়ার হিসাবে নীরদের কুলিয়ে যায়। প্রতিমা থাকতেই কুলিয়েছে; এখন তো সংসার আরো ছোট হয়ে গেছে। একটা ছোট টিপয়ের ওপর তার রাত্রের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রাখে হরির মা। কাচের গ্লাসে জল। গ্লাসটার মুখে একটা-কিছু ঢাকনা থাকে। আজ সেটা নেই। হরির মা ভুলে গেছে, না ঢাকনাটা ইঁদুরে-টিদুরে ফেলে দিল নীরদ চিন্তা করতে-করতে লোহার চেয়ারটা টিপয়ের কাছে টেনে নিল। চেয়ারটা সিমেন্টের ওপর ঘষা খেয়ে কড়াৎ করে একটা শব্দ তুলল। শব্দটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে নীরদ কান খাড়া করে ধরল। আর কোনো শব্দ না হয়—এভাবে আস্তে, প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে সে চেয়ারে বসল। বেশ কিছুটা সময় কাটল। না, পৃথিবী মরে আছে। আজ আর কোনো শব্দ হবে না এবাড়ির কোথাও।

সব ঘুমে বেহুঁশ। কেবল আমি জেগে আছি আর আমার রুগ্ন সহিষ্ণু শান্ত ছেলে। জেগে থেকেও যে শব্দ করতে চায় না। এখন হয়তো সেই জাগাটুকুও ঘুমে আচ্ছন্ন নির্জীব হয়ে এল। নীরদের একবার ইচ্ছা হল পা টিপে-টিপে ও-ঘরে গিয়ে দেখে খোকা ঘুমিয়ে পড়ল কিনা। যেন খোকা ঘুমিয়ে পড়লে আমি স্বস্তিবোধ করব। তাই কি? কোনো শব্দ না হয় এভাবে থালার ঢাকনাটা তুলে একদিকে সরিয়ে রেখে নীরদ ভাত ভাঙতে লাগল। খোকা ঘুমিয়েছে ধরে নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর? ভাতের গ্রাসের সঙ্গে মাছভাজা ভেঙে মুখে তুলে নীরদ কড়িকাঠের দিকে তাকায়। ঘুমন্ত খোকার মুখের পাশে আর-একটা মুখ। আগে এটা হত না। এখন ঘন-ঘন নীরদ ছেলের মুখের পাশে আর-একটা মুখকে দেখছে। যেন দুটিতে যুক্তি করে নীরদের সামনে এসে দেখা দিচ্ছে। আশ্চর্য, এর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক! সম্পর্ক নেই, থাকার কথা নয়, সম্পর্ক সৃষ্টি করছ, তুমি, তুমি নীরদ। ভাতটা গলার কাছে তেতো-তেতো ঠেকে। নীরদ কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে গ্লাস তুলে জল খায়। যেন আমার এই অস্তিত্বের রূপ বদলে ফেলতে পারলে আমাকে ঘিরে আমার চোখের সামনে দুটি মুখের ছবি একসঙ্গে ভেসে ওঠা বন্ধ হবে। তাই কি চেয়েছিল আজ নীরদ? সারাদিন অফিসে বসে এই চিন্তা করেছিল? সুধাংশুকে বলতে সাহস পেল না বলে নিজের রূপ বদলাতে কিছু খাদটাদ মিশিয়ে ঢালাই-পেটাই হয়ে অন্য মানুষ, সম্পূর্ণ অন্য এক নীরদ হয়ে ঘরে ফিরতে চেষ্টা করেও কিছু কাজ হল না। নিরুপায় ব্যর্থ নীরদ আবার একটা ভাতের গ্রাস গিলতে চেষ্টা করল, তারপর যেন ভয়ে-ভয়ে, ওপরে কড়ি-কাঠের দিকে চোখ মেলে ধরল। ঠিক আছে দুটিতে। মলিন বিষণ্ণ চোখ মেলে খোকা হাসছে। কামনা বাসনা লোভ লাম্পের

আগুন দু-চোখে জ্বেলে রেখে খোকার পাশে ও হাসছে। চুপ করো, হাসি থামাও, আমার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াও, সম্পূর্ণ পিছন ফিরে থাকো—কাকে বলবে? কাকে বলতে চাইছে নীরদ? কোন্ মুখকে? গলায় ভাত আটকে গেল নীরদের, কপালটা আবার ঘামছে। আবার সে জলের গ্লাস তুলতে কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে আনল। খাওয়া হল না। ডিস্‌পেপটিক রোগীর মতন পেটের ভিতরটা কেমন যেন ফুলে আছে, গুরগুর করছে। আর একটা ভাত মুখে তুললে বমি হবে। সত্যি তো তার বমি হবে! দেশী-বিলাতী দু-জাতের এতটা পেটে গেলে বমি না হয়ে যায়! চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে নীরদ তাড়াতাড়ি নর্দমার মুখের কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিতে হড়হড় করে টক দুর্গন্ধ নরম শক্ত কত কি সব বেরিয়ে এল। একবার দুবার। মাথাটা পাতলা হয়, পেটের ভারটা কমে। বেশ হালকা বোধ করে সে। ভালো লাগছিল তার এখন। মুখটা ধুয়ে ফেলল। বালতি উপুড় করে সবটা জল নর্দমায় ঢেলে দিয়ে বমিটা সরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে এল। তারপর আলো নিভিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নীরদ শোবার ঘরে এসে ঢুকল। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। 'খোকা ঘুমিয়েছিস?' অত্যন্ত আস্তে ডাকল নীরদ। সাড়া নেই। খোকা ঘুমিয়ে পড়ল আর শরীরটাও হালকা লাগছে, যেন দুটো একসঙ্গে ঘটল বলে নীরদ হঠাৎ খুব নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত এবং স্বাধীন! একটা হালকা স্ফূর্তির আমেজ মাথায় নিয়ে সে টেবিলের টানা খুলে নতুন সিগারেটের প্যাকেট বার করল। বার করে কি করতে যাবে,—এমন সময়। মাত্র একবার শব্দটা হয়। অন্ধকার প্যাসেজের শক্ত বোবা সিমেণ্ট এইটুকুন একটা চামচের আঘাতে আর্তনাদ করে উঠে আবার চুপ। অত্যন্ত পরিচিত নীরদ এই করুণ আকৃতির সঙ্গে। নিশির মধ্যপ্রহরের

কামনা লোভ লাস্য একটা চামচ চাবি কি টিনের কৌটোর মুখ ছিটকে পড়ার ঝনঝন শব্দ হয়ে নীরদের বুকে এসে ধাক্কা দেয়, মগজে বাড়ি মারে। আর অভ্যস্ত চঞ্চল পায়ে নীরদ ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে প্যাসেজের অন্ধকারে ছুটে যায়। খেতে বসে আমি কি এই শব্দ শুনতে বার বার কান খাড়া করে ধরেছি ? কান খাড়া করে ভেবেছি পৃথিবীর আর কোনো আকৃতি আজ আমাকে ঘরের বাইরে টেনে নিতে পারে না ? আমি অন্য মানুষ, আমি অন্যরকম ? চিন্তা করল নীরদ। চিন্তা করে মনে হল এতক্ষণ সে দুঃস্বপ্ন দেখছিল, প্রলাপ বকছিল নিজের সঙ্গে। এখন সে তার পরিচিত অভ্যস্ত স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে পেয়েছে। মনে হওয়ামাত্র আর এক সেকেণ্ড দ্বিধা না করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছে ছুটে গেল।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?'

'না।'

'কাঁদছিলে মনে হয়।'

'বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

নীরদ চুপ করে রইল একটু সময়।

'মুখ থেকে এত খারাপ গন্ধ বেরোচ্ছে কেন ?'

নীরদ একটা ঢোক গিলল, তারপর প্রবল আকর্ষণে মালার মুখটা আবার বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওর চুলে কপালে নাকে চিবুকে বার বার চুমু খেতে লাগল। মালা কাঁপছে। নীরদের পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। যেন একটা-কিছুর ভর না পেলে দুজন পড়ে যাবে, তাই কলঘরের সামনের ছোট দেয়ালটা অবলম্বন করে দুজনে দাঁড়ায়। মালা ঘামছে। নীরদ ঘামছে। নীরদের গেঞ্জি ভিজে

গেছে, মালার ব্লাউজ ঘামে ভেজা। বুকের দিকটা পিঠের দিকটা।

'কথা বলছেন না কেন ?' মালা ঢোক গিলছে—শব্দটা নীরদের কানে লাগল।

'কি কথা ?' ওর বুকের ওপর থেকে মুখ তুলে নীরদ চোখ দুটো দেখল। অন্ধকারে চোখ জ্বলছে। স্ফুরিত নাসারন্ধ্র মালার। থুতনি তুলে নীরদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কি কথা আপনি কি জানেন না !'

গরম ঠোঁট দুটো আবার ওর থুতনির ওপর চেপে ধরল নীরদ। এবার একটু জোর করে থুতনিটা ছাড়িয়ে নিল মালা।

'কথা বলুন। এখনি কেউ জেগে উঠে বাইরে আসতে পারে।'

'আমি চিন্তা করছি, আমি তো বললাম, চিন্তা করে দেখছি।' খসখসে গলায় নীরদ উত্তর দেয়।

'এখনও চিন্তা !' চাপা নিশ্বাস ফেলল মালা। 'আর চিন্তা করার সময় নেই।' একটু থেমে পরে বলল, 'তুমি কি জান না কত কষ্টে এখানে আমার দিন কাটছে ! দিন কাটছে না।'

এই প্রথম নীরদ 'তুমি' সম্বোধন শুনল। তার হাত দুটো হঠাৎ কেমন শিথিল হয়ে আসছিল। দু পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। যেন পড়ে যাবে। যেন পড়ে না যায় এভাবে শক্ত করে মালাকে ধরে রইল।

'কী হল ?' মালা এবার আর নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল না। নীরদের বুকের সঙ্গে মিশে রইল। 'কথা কও।' অস্ফুট আর্তনাদের মতো গলার স্বর। 'কথা কও।'

'আজ আমি খুব বেশি মদ খেয়েছি।' নীরদ মৃদু হাসল। 'তাই মুখে এত গন্ধ পাচ্ছ।'

'কেন !'

'তোমাকে ভুলতে,—তোমার—'

কথা শেষ করতে দিল না মালা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

'এই শোন !'

সরে দাঁড়িয়েছিল মালা। নীরদ হাত বাড়িয়ে ডাকল।

'শোন, ঠাট্টা করছিলাম।'

মালা আবার বুক ঘেঁষে দাঁড়াল।

'আমাকে ভুলতে চাইলেও আমি ভুলতে দেব না, তুমি জানো ?' ফিসফিস করে বলল বটে ও, কিন্তু নীরদের মনে হল তার ছু-কানে যেন একটা ঝড় ফুঁসিয়ে উঠল। 'আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার শরীর মনের সব বোধ রেণু-রেণু করে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভাইয়ের সংসারে দাসীগিরি করছিলাম। আজ— আজ তুমি—'

'ছিঃ, কাঁদে না।' নীরদ হাত দিয়ে ওর চোখের জল মোছে। 'আমি সত্যিই ঠাট্টা করছিলাম।'

'না, আজ দুদিন ধরে লক্ষ্য করছি তুমি যেন একটু অন্যমনস্ক। যেন আমাকে এড়াতে চাও। তখন অফিসে বেরোচ্ছ, আমি একটা বাটি ধোবার ছল করে তাড়াতাড়ি কলতলায় ছুটে এলাম। একটু কেশে শব্দ করলাম পর্যন্ত ; তুমি তাকাও নি, তুমি ঘাড় ফেরাও নি।'

'ভাবলাম তোমার বৌদিও বুঝি কলতলায় আছে।'

'না, ছিল না।' চাপা কণ্ঠস্বর আবার ঝড়ের মতো ফুঁসিয়ে উঠল। 'আপনি সত্যি করে বলুন মনে-মনে কি ঠিক করেছেন।' এবার 'আপনি' সম্বোধনটা গরম শলার মতো নীরদের কানে ফুটল আর সঙ্গে-সঙ্গে সে ভয় পেল। যেন ও তাকে ঠিক চিনে ফেলেছে। আর লুকিয়ে চলার উপায় নেই। তথাপি নীরদ মৃদু গলায় হাসল। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। খোকার জন্য মনটা মাঝে-মাঝে খারাপ থাকে—তাতেই যদি তুমি—'

'আমি তো সে-কথা বলি না।' প্রবল বেগে মালা মাথা নাড়ল।

খোঁপা অনেকক্ষণ আগেই ভেঙে গেছে, এবার ঝাঁকুনি খেয়ে চুলের রাশ অন্ধকার বন্যার মতো ফুলে উঠল, ফেঁপে উঠল। 'খোকাকে আপনার চেয়ে আমি কম ভালোবাসি না। আমিও সারাক্ষণ ওর কথা ভাবি। দুপুরে ফাঁক পেলে লুকিয়ে ওর কাছে যাই। ও আমায় ভালোবাসে। খোকাকে নিয়ে আমি বেশ থাকতে পারব।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল নীরদ। এতদূর,—মনে-মনে এতটা অগ্রসর হয়ে আছে এই মেয়ে! ভেবে নীরদের মুখে কথা সরল না কিন্তু তার বিস্মিত বিব্রত হওয়ার এইখানেই শেষ নয়,—যেন আর একটু বাকি আছে। মালার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। যেন চরম কথা শোনাতে সে নীরদের শিথিল হাতের আকর্ষণ থেকে আর-একবার নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাত দিয়ে এলোচুল ঠিক করতে-করতে বলল: 'আগুন জ্বালিয়ে এখন আমি ভুলতে চাইছি। বেশ, যদি তাই তোমার মনের ইচ্ছা, দেখবে আমি কি করি।'

'কী করবে?' নীরদ এক-পা এগিয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল ওকে। মালা ধরা দিল না। দু-পা পিছিয়ে গেল।

'কী করবে?' আর-একবার প্রশ্ন করতে চেষ্টা করল নীরদ। কিন্তু তার আগেই অন্ধকারের বুক চিরে ঝড়ের ফুঁসানি তার কানের পর্দার ওপর এসে আছড়ে পড়ল।

'গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আমি সব জ্বালা জুড়াব।'

'এই শোন, কি-সব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ!' নীরদ ফিসফিসিয়ে বলল বটে, কিন্তু মালা তার আগেই ভিতরে ঢুকে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়েছে। ছিটকিনি তোলার শব্দটা টুক্ করে এসে তার কানে লাগল। যেন দু-পায়ের ওপর দাঁড়াবার শেষ শক্তিটুকু নীরদের চলে গেল। কোনোরকমে দেয়াল ধরে-ধরে সে নিজের ঘরে চলে এল।

সাত

প্রথমে নীরদের মনে হল মেয়েটা যে খুবই অশিক্ষিত, এটা তার প্রমাণ। অমার্জিত এবং অশিক্ষিতেরা এখনও এই যুগে একরোখা থেকে গেছে। তাদের বৈশিষ্ট্য সামান্য একটু কিছুতেও তারা ভয়ঙ্কর সিরিয়স হয়ে উঠতে পারে। জীবন যাক আর থাক। অথবা কথায় কথায় জীবন দেওয়া, কথায় কথায় অপরের জীবন নেওয়া।

অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে-টানতে নীরদ চিন্তা করছিল। যেন জীবনটা কিছুই নয় এদের কাছে। আমি সুইসাইড করব। আমি তোমাকে খুন করব। নীরদ একবার নিজের মনে হাসল। তার এখন রাণু ভৌমিকের মুখটা মনে পড়ল। মেলামেশা ভোগ-সম্ভোগ তার জীবনে যথেষ্ট হয়েছে। রাণু ভৌমিকের জীবনে অনেক আশার আলো জ্বলেছে, তারপর আবার এক-একটা দমকা হাওয়া এসে সেগুলোকে নিভিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা কি কোনোদিন কল্পনা করা যায় যে রাণু ভৌমিক হতাশ হয়ে বঞ্চিত হয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে শেষ করবে? না কি মাথা খারাপ করে চ্যাটার্জির জীবন নষ্ট করতে তার পিছু-পিছু ধাওয়া করবে? আর আজ, এখন, অন্ধকার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটার মুখে সে কী শুনল? 'এমন কথা ওর মুখ থেকে বেরোবে আমি কোনোদিন কল্পনা করিনি। আমি তো ভেবেছি—'

কী ভেবেছিল নীরদ? হাতে সিগারেট জ্বলছে। কিন্তু তা টানতে ভুলে গিয়ে চোখ বুজে সে তিন মাস আগের প্রথমদিনের ঘটনা থেকে সব এক-এক করে মনে করতে চেষ্টা করল। খুব

স্বাভাবিক, পাশাপাশি ফ্ল্যাট, তুপুরবেলা সে ঘরে থাকে না, হরির মা আর নীরদের রোগা ছেলে আছে, এ-অবস্থায় ওর দাদা বৌদি বাড়ি নেই, দাদার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এঘরে এসে বসবে, ওদের সঙ্গে কথা বলবে। বেশ কিছুকাল ধরেই এরকম চলছিল। নীরদ পরে চিন্তা করে দেখেছে। সেদিন হঠাৎ শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে আধখানা অফিস করে সে ঘরে ফিরে বাবুর শিয়রের কাছে খাটের ওপর একটি মেয়েকে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে দেখে নীরদ খুব বিস্মিত হয়নি, এবং পাশের ফ্ল্যাটের মেয়ে সে দেখেই চিনল। সেদিন ভালো করে দেখল মেয়েটির বয়স খুব বেশি না। মুখখানা মিষ্টি। কেমন যেন একটা সারল্যের ভাব রয়েছে। একটা সাধারণ আটপৌরে সবুজ শাড়ি-পরা। ছিটের একটা ব্লাউজ যেন গায়ে ছিল নীরদের মনে পড়ে। তবে নীরদকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল ওর গায়ের রং। ঘরে ঢুকেই নীরদের প্রথম যা মনে হয়েছিল এত ভালো রং সে অনেকদিন দেখে নি, হয়তো কোনোদিনই দেখেনি। তাই তুবার সে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখেছিল। কিন্তু এটাও সত্য, এবং আজকের এই পরিণতির জন্য হয়তো ওই মেয়েও কিছুটা দায়ী, কেন না, যতবার নীরদ সেদিন ঘাড় ফিরিয়েছে একজোড়া চোখ স্থিরভাবে মেলে ধরে মেয়েটি তাকে দেখছিল। লক্ষ্য করে নীরদ কিছুটা অবাক হয়েছিল। তারপর সে চিন্তা করেছে, অতিরিক্ত সরল বলেই একজন পুরুষকে কাপড় ছাড়তে দেখে সেদিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে যে অশালীনতা কিছু থাকতে পারে তা ওর মাথায় ছিল না। তারপরও মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘরে ছিল। চেয়ারে বসে নীরদ কাগজ পড়ছিল। বেদানা ভেঙে একটা-তুটো দানা বাবুর মুখে ভেঙে দিতে-দিতে হরির মার সঙ্গে মেয়েটি কলের জল, ঘুঁটের দাম, গরম পড়েছে,

বৃষ্টি নেই, মাছ না মিললে রোজ হাঁসের ডিম কত খাওয়া যায় ধরনের কথা বলতে শুনছে। তারপর একসময় বাচ্চাটা খুব কাঁদাকাটা আরম্ভ করতে বিরক্ত হয়ে মেয়েটি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘরে মেয়েছেলে না থাকলে প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীদের সম্পর্কে কোনো পুরুষই বিশেষ কিছু সংবাদ পায় না। পায় না এবং পাওয়ার ইচ্ছাও বড়-একটা রাখে না। নীরদের তাই হয়েছিল। তাছাড়া এরা নতুন ভাড়াটে। এদের আগে পাশের ফ্ল্যাটে যারা ছিল তাদের সম্পর্কে নীরদ অনেক-কিছু কেন, প্রায় সবকিছু সংবাদই পেত প্রতিমার কল্যাণে। ভদ্রলোকের সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, একটা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল নীরদের। তারপর চাকরির ব্যাপারে হঠাৎ রমেন নাগ অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়াতে সে-ঘর ছেড়ে দেয়। তারপর মাস-দুই ফ্ল্যাটটা খালি থাকার পর কবে জানি একদিন নতুন ভাড়াটে আসে। এরা কারা, পুরুষটি কে, কোথায় চাকরি করে, এর আগে কলকাতায় অন্য পাড়ায় ছিল না কি মফঃস্বলের লোক; এক ভদ্রমহিলা ছাতা-ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বেলা দশটায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান, তিনি কি বাড়ির গৃহিণী, কি কাজ করেন, একটি মেয়ে সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি নেই বোঝা যায় না, কে ও, মহিলাটির কে হয়? বোন? ননদ? বোনের মেয়ে? ভাগ্নী? নীরদ কিছুই জানত না। প্রতিমা বেঁচে থাকলে রমেন নাগের স্ত্রীর মতো হয়তো প্রথমদিনই এই ফ্ল্যাটে বেড়াতে আসত ওই ফ্ল্যাটের কোনো-না-কোনো মেয়ে। পরিচয় হত। সেই সূত্রে দুই ফ্ল্যাটের পুরুষদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় বন্ধুত্ব। কিন্তু প্রতিমার অনুপস্থিতিতে সে-সব আর হয়নি। কাজেই প্যাসেজ ধরে যেতে-আসতে, কি কলতলায় যদি কেউ এসেছে নীরদ ভাসাভাসা ওপর ওপর এক-একটি মুখ দেখেছে। যেমন রাস্তায় কি ট্রামবাসে চলতে

সে পুরুষের মুখ দেখে, মেয়ের মুখ দেখে। পরিচয় হয় না, কথা হয় না, অন্তরঙ্গতার প্রশ্ন ওঠে না।

সেদিন মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর হরির মা পরিচয় দিল। দাদার সংসারে আছে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না। লোকটা মাতাল চরিত্তিরহীন। দেড় বছর হয়নি বিয়ে হয়েছে। ওকে মারধর করে। এখানে দাদার কাছে চলে এল। সুখে নেই। দাদা লোক ভালো। বৌবাজারে চায়ের দোকান। তেমন আয় নেই ব্যবসায়ে। ভাই-বৌ বি-এ পাশ। এখন ইস্কুলে চাকরি করে। না করে করবে কি। আর তাই না সব রাগ ঝাড়ছে এখন মেয়েটার ওপর। হুঁ, ননদের ওপর। বাড়তি মুখ সংসারের। খরচ ডবল বেড়ে গেল। কথায়-কথায় মুখ-ঝামটা। অথচ সারাটা দিন, আমি তো চোখের ওপর দেখি, মুখ বুজে মেয়েটি হাঁড়ি ঠেলছে, কাঁড়ি-কাঁড়ি বাসন ধুচ্ছে, ঘর মুছছে, জল টানছে, তার ওপর একটা বাচ্চা। আমি তো দেখেছি গেল-কার্তিকে যখন এ-বাড়ি এসে উঠল মালা, দুগ্‌গাঠাকুরের মতো গায়ের রং ছিল, কেমন জবরদস্ত শরীর ছিল। এখন তো সেই রঙের কিছু নেই, খেটে-খেটে দেহ আধখানা করে ফেলেছে।

একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল নীরদের কাছে। বাচ্চাটা ওর না, দাদার। স্বামী-পরিত্যক্তা। তাই কি? না স্বামী-পরিত্যাগকারিণী? পরে অবশ্য নীরদ মালার মুখে সবই শুনেছে, এখনও শুনছে।

হ্যাঁ, সেই প্রথমদিন খুব কাছে থেকে দেখার পর এবং হরির মার মুখে সব শুনে নীরদ মেয়েটিকে আর ভুলতে পারেনি। কলতলায়, প্যাসেজে, কি ওদের দরজায় মালা দাঁড়িয়ে আছে দেখলে নীরদ তৎক্ষণাৎ ওর দিকে বেশ একটু মনোযোগ দিয়ে তাকিয়েছে। এটা

নীরদের নিজের দিকের কথা। আর ও? মালা নিজে? নীরদের জুতোর শব্দ গলার শব্দ শুনতে পেয়েছে তো চট্ করে ও কাজে-অকাজে কলতলায় ছুটে এসেছে, দরজায় এসেছে, ঘোরানো সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর? তারপর নীরদ আর চোখ বুজে থেকে চিন্তা করতে পারল না। একটা অদৃশ্য শক্তি তার চোখের পাতা দুটো টেনে খুলে ফেলল। অন্ধকার ঘর। অদৃশ্য শক্তি সেখানেই থামল না। জোর করে তার থুতনিটা ওপরের দিকে ঠেলে তুলে দিল। সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকার কড়িকাঠ দেখল নীরদ? না। বড় একটা আয়না। আয়নার ভিতর আর-এক নীরদ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে চেয়ারে-বসা নীরদকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আর কেমন কটমট করে তাকাচ্ছে। প্রশ্ন করছে: 'তারপর? তারপর কি হয়েছে তুমি বল?'

কেমন ভয় পেয়ে নীরদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হল তাকে কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে আনতে। কিন্তু নিচেও সেই আয়না। সেই নীরদ। আঙুল তুলে আছে। কটমট করে তাকাচ্ছে। প্রশ্ন করছে: 'তারপর?' নীরদ ঘেমে উঠল। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। পাখাটা চালিয়ে দেবে কিনা চিন্তা করল। কিন্তু রাত্রে পাখার হাওয়া বাবুর সহ্য হবে না, ঠাণ্ডা লাগবে চিন্তা করে পাখার কথা ভুলতে হল। 'তারপর? প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন, তার—'

নীরদ বিড়বিড় করে কি বলতে আয়নার নীরদ হেসে উঠল। 'বুঝলাম ও খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ছলছুতো করে তোমাকে দেখতে এসেছে; তুমিও চোখ বুজে থাক নি, বরং তোমার রক্ত একটু বেশি চঞ্চল হয়ে উঠত—কিন্তু, কিন্তু—'

নীরদ চোখ বুজল।

'কথা বল ? উত্তর দাও !'

নীরদ চোখ খুলল। এবার আয়নায় নীরদ নেই। কটমট করে আর একজন তাকিয়ে আছে। আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে নীরদের দিকে। 'আমি, আমাকে ফাঁকি দিতে পারছ না তুমি, আমি সব দেখেছি, আমার চোখের সামনে এ-ঘরে তুমি ওর কাছে প্রেম নিবেদন করেছ—সব বুঝি, স্বীকার করি, প্রমত্ত যৌবন তোমার সামনে ঘুরে ঘুরে আসছে, তুমি লোভ সামলাতে পার নি। কিন্তু এখন—'

পড়ে যেত নীরদ। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে ধরে রইল। প্রতিমা তখনও কথা বলছে, রুক্ষ নির্দয় শাণিত কণ্ঠস্বর। চোখ বুজে থেকে নীরদ করবে কি ! প্রত্যেকটা কথা তার বুকে এসে বিঁধছে। 'ঠিক বলেছে মালা, আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সরে আসার কোনো অধিকার নেই তোমার। বাবু ? আমার ছেলে ? তোমার রুগ্ন অথর্ব সন্তান ? তার কথা ভেবে আজ তোমার বিবেক জাগল ? কী বললে ? দুদিনের খেলা ? তা হয় না, তা হয় না। তোমার অফিসের রাণু ভৌমিকরা বিষদাঁত উপড়ে ফেলে তারপর প্রেমের খেলায় মেতেছে। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের ডলিদের বিষ-দাঁত নেই, গজায় নি। জাত আলাদা। কিন্তু এ ছাড়াও সংসারে নারী আছে, ক্ষুধা আছে, আগুন আছে, প্রতিশোধ আছে। সেই প্রতিশোধ পৃথিবীতে কত প্রলয় সৃষ্টি করে গেছে তুমি কি জান না মূর্খ !' দু-হাত দিয়ে জোরে চোখ চেপে ধরে আছে নীরদ, যাতে পাতা দুটো খুলে না যায়, প্রতিমাকে দেখতে না হয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রের সবটা ব্যাপার মনে পড়তে নীরদ নিজের মনে হাসল। বস্তুত কি কারণে তার মনের

অবস্থা ওরকম দাঁড়িয়েছিল তলিয়ে আর এখন সে ভাবতে গেল না। সময় নেই। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে, একটা অহেতুক বিভীষিকা নিজের মন থেকে তৈরি করে সে যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এটাই সত্য।

হরির মার কড়া নাড়া হাঁক ডাক শুনে সে বিছানায় উঠে বসল, আর চিন্তা করল, 'রজ্জু দেখে আমি সর্পভয় পেয়েছি। আমার সমস্ত ভাবনাটাই ভুল হয়েছিল, ভুল পথ ধরে চিন্তার সূত্র টেনে টেনে কোন এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছিলাম, আরে রাম!'

'দাদা বাবু! আমার খোকন সোনা!'

'খুলছি খুলছি, আমি জেগেছি।'

'খুলছে, মাসি, বাবা এখুনি দরজা খুলে দিচ্ছে।'

ওধারের বিছানায় সদ্য ঘুম ভাঙা খোকন হাই তুলছে, বাইরে মাসির ডাক শুনে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে এপাশে বিছানায় বাবাকে দেখছে। বাবা গম্ভীর, বাবাকে মনে হয় যেন একটু অসুস্থ। উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গিটা ভাল করে পরছে। কেবল মাসির ডাকের উত্তর দেওয়া ছাড়া খোকন আর কিছু বলল না। আর একটা হাই তুলল শুধু।

নীরদ খাট থেকে নেমে দরজার ছিটকিনি নামিয়ে দেয়। পাল্লা টা খুলে যায়।

'এই নাও, তোমার টিপবাতি খারাপ হয়ে গেল, কাল কি আর সারারাত আমার ঘুম হয়েছে। যন্তরটা খারাপ করে ফেললাম। সিঁড়ির পথটা তো ভালয় ভালয় নামলাম। নীচে গলি ছেড়ে সদর রাস্তায় গেছি, ওমা, আর তো জ্বলছে না, কত টেপাটিপি করলাম, উঁহু।'

শুকনো মুখে নীরদ হাসল, হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিল। একটু নাড়াচাড়া করল। তারপর সেটা টেবিলে রেখে দিতে দিতে বলল,

'খারাপ হয়েছে কে বলল হরির মা ? ব্যাটারি ফুরিয়েছে। আজ আবার আমি ব্যাটারি এনে রাখব।'

'নাগো দাদাবাবু, আমার ভয় করে, আমার কেবল ভয় আমার হাত লাগলে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'বলছি তো নষ্ট কিছু হয়নি।' নীরদ হাত বাড়িয়ে টুথব্রাশ পেস্ট তুলে নিল, তোয়ালেটা টেনে আনল ব্র্যাকেট থেকে। 'আর যদি নষ্টই হয়, ঠিক করে আনা যাবে, অত ভয় কেন তোমার।'

হরির মা ততক্ষণে বাবুর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কেমন আছ সোনা আমার, রাতে ঘুমটা ভাল হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, মাসি।' বাবু হাসল। 'তা তুমি অত ভয় করছ কেন, বাবা কি বলছে শুনলে তো, নষ্ট হলে টর্চ লাইট ঠিক করে দেবে। টর্চ লাইট না হলে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তুমি নামতে পারবে নাকি। যা বিচ্ছিরি সিঁড়ি আমাদের !'

বাবুর হাসিমুখ দেখে হরির মার মুখখানা এই প্রথম হাসিখুশি হয়ে ওঠে। ঘাড় ফিরিয়ে নীরদের দিকে তাকায় একবার। তারপর আবার বাবুর চোখের ওপর চোখ রাখে। 'আমার বাবা একটা কেরোসিনের ডিবি হলে কাজ চলে যায়। সিঁড়ি আর গলিটা তো পার হওয়া। সদর রাস্তায় উঠলে আর ভয়টা কি। রাজ্যের ইলেট্রি বাতি চাঁদের রোশনাই ঝড়ায়।'

'ইলেট্রি' কথাটা শুনে বাবু খিলখিল হাসে। নীরদ হাসছে কিনা হরির মা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে বলে দেখতে পায় না। হরির মা হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়।

'তাই তো চলতো, একটা ডিবি জ্বেলে বেশ আমি নিচে নামতে পারি। কাল যন্তরটা খারাপ হল আর এমন ভয় ঢুকল মনে, অপরের জিনিস কত দামী বাতি, ভাবনায় ভাবনায় রাতে আর ঘুম আসে না চোখে।'

'আমরা কি এখনও তোমার পর আছি হরির মা।' এবার নীরদ শব্দ করে হাসল। 'তা ছাড়া আড়াই টাকা দাম ওটার। খুব দামী জিনিস না।' বলে নীরদ মুখে ব্রাশ গুঁজে বাইরে প্যাসেজের কলের দিকে চলে গেল।

'শুনলে, শুনছো তো বাবার কথা।' বাবুর চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে ওঠে। 'তুমি আমাকে এত ভালবাস, বাবাকে এত ভালবাস, আমরা কি তোমার এখনও পর আছি। আড়াই টাকা মোটে টর্চের দাম। পঞ্চাশ টাকার একটা জিনিসও যদি তুমি ভেঙে ফেলে নষ্ট করে দাও, আমরা কিছু বলব না, আমি তো না-ই, বাবাও না, বুঝলে মাসি, বাবার মনটাও খুব নরম, খুব ভালমানুষ আমার বাবা।'

হরির মা আর কিছু বলল না। হাত দিয়ে বাঁ চোখটা মুছল। নীরদের খাটের কাছে সরে গিয়ে বিছানাটা টেনেটুনে ঠিক করে দিল, বালিশ দুটো আর একটু ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে সোজা করে রাখল, তারপর ফিরে এল বাবুর বিছানার কাছে। 'আমি উননে আগুনটা দিয়ে আসি বাবা, দাদাবাবুকে চা করে দিতে হবে, তোমার হর্লিকের জল গরম করব, এসে তোমার মুখ ধুইয়ে দেব।' তারপর যেন কি খেয়াল হল বুড়ির। 'ওমা, দাদাবাবু মুখ ধুতে বাইরের কলে চলে গেল! আমি তো কাল বালতি কলসী সব ভরে রেখে গেছি! কি দরকার ছিল বারান্দার কলে ছোটার। এজমালী কল, সকাল বেলা কি অবসর আছে,—গিয়ে না দাঁড়িয়ে থাকবে কলতলায় একটা ঘণ্টা।' বিড়বিড় করতে করতে বুড়ি পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে কলসী বালতি সব শূন্য দেখে বুড়ি একটু অবাক হল। এত জল তো লাগবার কথা নয় দাদাবাবুর। তবে কি—প্রশ্নের উত্তর সহজে মিলল। 'রাতে চান করেছে দাদাবাবু, তাই তো সবটা

জল লাগল।' বুড়ী নিজের মনে বলল, 'তা অত রাতে চান করা কি ভাল। এখন বাদলার দিন আরম্ভ হয়েছে, ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগে না অসুখ-বিসুখ করে।' যেন বুড়ী কল্পনা করল দাদাবাবুর জ্বর হয়েছে। খোকা এক বিছানায়, দাদাবাবু আর এক বিছানায় শুয়ে। বুড়ীকে এখন দুজনের শুশ্রূষা করতে হচ্ছে। দাদাবাবুর আপিস কামাই চলেছে একটানা উনিশ দিন। আ, মরণ! বুড়ী চমকে উঠল। হঠাৎ কেন কুভাবনা করছে সে। ভাল না ভাল না। 'ভগমান, মা কালী, শীতলা ঠাকরুণ, আমার অসুখ দাও, আমার মরণ দাও। দাদাবাবু বাঁচুক। খোকা সকাল সকাল ভাল হয়ে উঠুক। বুড়ীকে সংসার থেকে তুলে নাও। শক্ত সমর্থ থেকে দাদাবাবু রোজগার করুক, বিষয়-সম্পত্তি বাড়ি-ঘর করুক। হরি হরি!' বুড়ী বালতি কলসীর কাছ থেকে সরে এসে কোণার দিকে ঘুঁটে আনতে পা বাড়াল। সে কল্পনাই করতে পারল না কাল বমি ধুতে নর্দমা পরিষ্কার করতে নীরদকে বালতি কলসী উপুড় করে জল ঢালতে হয়েছিল।

কলতলায় কেউ নেই। ওপাশের দুটা ঘরের দরজা তখন পর্যন্ত বন্ধ। দেখে নীরদ নিশ্চিন্ত হল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ইচ্ছামতন দাঁতে ব্রাশ ঘষল, তারপর ট্যাপ খুলে বার বার আঁজলা ভরে প্রচুর জল মুখে পুরে কুলকুচি করলো। মুখের ভিতরটা ভারি শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্মল মনে হতে লাগল তার। তেমনি তার মন। হাল্কা বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই ময়লা নেই অন্ধকার নেই হতাশা নেই অস্থিরতা নেই। দিনের আলোর মতন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন স্থির সংযত। নীরদ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভাবল, সামান্য একটা কথার কত সাংঘাতিক অর্থ করা যায়, সাধারণ একটু অভিমানের কত নিগূঢ় ব্যাখ্যা করে ফেলে মানুষ নিজে ঠকে অপরকে ঠকায়। কিছুই তো বলেনি কাল মালা। খুব স্বাভাবিক,

নীরদকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখে ও একটু হতাশ হবে অভিমান করবে। এটাই স্বাভাবিক। মান আর অভিমান। হৃদ্যতার ব্যাপারে, ভালবাসার প্রেমের জগতে চিরকালের সেই মান অভিমান চোখের জল আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে চিন্তা করে নীরদ নিজের মনে হাসল। এগুলো নারীর সৌন্দর্য এগুলো নারীর কমনীয়তা অতিরিক্ত বিভা। নারীদেহ সুন্দর, (সব নারীর না যদিও) কিন্তু দেহের অতিরিক্ত আরও কিছু সৌন্দর্য, যেমন চোখের জল অভিমান কটাক্ষ ভ্রূবিলাস হেঁয়ালীপনা ইত্যাদি আছে বলে নারী পুরুষকে মুগ্ধ করে আচ্ছন্ন করে। তাই কি? মালার এই গুণগুলি আছে, নীরদ কদিনে জেনে ফেলেছে। যদিও নীরদ এসব অপছন্দ করে না। কিন্তু যদি না থাকত, অভিমান অশ্রু দীর্ঘশ্বাস কটাক্ষ কিছুই সে মালার মধ্যে না দেখত, তার খারাপ লাগত না; মালাকে ভাল লাগার ব্যাপারে তেমন যে একটা তারতম্য ঘটত নীরদ মনে করে না। হ্যাঁ, সে চিন্তা করে, যৌবন অতিক্রান্ত পুরুষ সে। তার ফলে বেশীর ভাগ মানুষ যা হয়। প্রয়োজনের কথা সে আগে চিন্তা করে, বাস্তবকে বেশী বোঝে। হাওয়া কোকিলের ডাক আকাশের রঙ এবং শুধুই অধরের ভঙ্গিমা নিয়ে মত্ত থাকা এ বয়সে মানুষের শোভা পায় না আর নীরদের ধাতেও এসব সয় না। সুতরাং যেদিন মালার দিকে সে হাত বাড়িয়েছিল সেদিন মনে কোন হেঁয়ালী না রেখেই সে কাজটা করেছিল। মালার সুন্দর দেহটা স্পর্শ করেছিল। সে তৃপ্ত। মালার দিক থেকেও তার প্রয়োজন ছিল। না হলে এত সহজে সে সাড়া দিত না। সব সমস্যা সব প্রশ্ন এখানেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ফুরায় কি। কাল রাত্রে নীরদ নিঃসংশয় হতে পেরেছে। মালার মন এভাবে তৈরী না। দেহের অতিরিক্ত আরও কিছু দেবার নেবার স্বপ্ন দেখছে ও। 'খোকনের জন্য

আটকাবে না, খোকন আমাকে ভালবাসে।' কী অদ্ভুত চিন্তা! অথচ—

ওদিকে দরজার ওপর চোখ বুলিয়ে নীরদ কলতলা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে এল।

উনুনে আঁচ দিয়ে হরির মা বাবুকে মুখ ধোয়াচ্ছে। কোনো কথা না বলে নীরদ টেবিলের ড্রয়ার টেনে প্যাড ও কলম বার করল। একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট ধরিয়ে একটু সময় চিন্তা করল। তারপর কলম তুলে সে চিঠিটার একটা খসড়া করতে আরম্ভ করল। অনেক কাটাকুটি করতে হল। তা হলেও শেষ পর্যন্ত সবগুলো কথা বেশ পরিষ্কার করে সে প্রকাশ করতে পারল। ভাষাটা বেশ সহজ হয়েছে দেখে নীরদ খুশি হল। কাব্যটাব্য কিছুই করল না সে। খসড়া হয়ে যেতে নীরদ সেটার একটা কপি তৈরী করে ফেলল। এবার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হল। সবটা চিঠি আগাগোড়া পড়ল সে। তারপর সেটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ভাঁজ করল। একটা ভাঁজ দুটো ভাঁজ তিনটে ভাঁজ। মুড়ে কাগজটাকে ট্রামের টিকিটের মতন ছোট করে ফেলল সে। কিন্তু তবু যেন বড় বড় লাগছে। আবার ভাঁজ করল। এবার ডাকটিকিটের মতন ছোট হয়ে গেল চিঠি। নীরদ নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাড় ফেরাতে দেখল হরির মা টেবিলে চা রেখে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে নীরদ পরম তৃপ্তি অনুভব করল। অস্ফুট একটা 'আ' শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। সত্যি নীরদের খুব অনুতাপ হয় কাল সে এমন অসতর্ক হতে গিয়েছিল কেন ভেবে। 'তোমাকে ভুলতে চাইছি।' একথা শোনার পর কোন্ মেয়ে মাথা ঠিক রাখবে। কাজেই 'গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বালা জুড়ানো' ধরনের কথা যদি মালার মুখ থেকে বেরোয় তো খুব অন্যায় হয় না। আসলে 'ভুলতে চাইছি' বলাটাই নীরদের অন্যায় হয়েছে।

মনে যে-কথা আছে সর্বত্র সব সময় সেটা প্রকাশ করা মূর্খতা। যা হোক নীরদ শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছিল। এবং এই চিঠি মালার মন থেকে বাকী সংশয়টুকু মুছে দেবে। 'ঠাট্টা করছিলাম, তোমার মন পরীক্ষা করছিলাম।' 'পরীক্ষা' কথাটা কাল নীরদ বলতে পারেনি, মনে আসে নি, আজ চিঠিতে তা বসাতে পেরে সে অধিকতর নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত আরামে সে এখন বড় একটা হাই তুলল, তারপর চায়ের পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

হরির মা চামচ নেড়ে নেড়ে কাচের গ্লাসে হরলিক্স তৈরী করছে। লুব্ধ প্রশান্ত চোখ মেলে বাবু সেদিকে তাকিয়ে আছে। নীরদ খোকার বিছানার ওধারে ঘুরে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল। দুটো পাল্লা ছড়িয়ে দিয়ে একেবারে দুদিকের দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। হলদে রোদের ছটায় ঘরের ভিতর উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে নীরদ ছেলের কপাল স্পর্শ করল। মিটিমিটি হাসছে বাবু। 'আজ আবার একটা খেলনা এনে দেব।' নীরদ সুন্দর করে হাসল। খোকা হেসে মাথা নাড়ল। 'খেলনার দরকার নেই, বাবা, তার চেয়ে আর একটা গল্পের বই এনে দিও।'

'উঁহু।' হরির মা মাথা নাড়ল। 'বই পেলে সারাদিন ওটা চোখের ওপর ধরে রাখে। এমন ধারা করলে চোখটা না খারাপ হয়ে যায় দাদাবাবু।'

বাবু ঈষৎ বিরক্ত হল মাসির কথায়। ছেলের চেহারা দেখে নীরদ বুঝল। কথা বলল না। চুপ করে রইল।

'চোখ খারাপ হবে না, তুমি এনে দিও বাবা অ্যাডভেঞ্চার গল্প। আগেরটার মতন।'

'তাই দেব।' নীরদ সস্নেহে ঘাড় কাত করল।

'কি জানি, বাপ বেটায় মিলে তোমরা যা খুশি কর। আমার কথার দাম কি।' বুড়ী বিরক্ত হয়ে চামচটা জোরে জোরে নাড়তে থাকে। কথাটা খুব মিথ্যা না, নীরদ চিন্তা করল, সারাদিন এমনি দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে আছে ছেলের। তার ওপর সব সময় বই খুলে চোখের সামনে ধরে রাখাটা ঠিক না। চিন্তা করল নীরদ, আর অবাক হল। অশিক্ষিত একটা ঝিয়ের বিজ্ঞান-সম্মত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ভেবে। আশ্চর্য এর বোধশক্তি।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।' নীরদ ছেলের বিছানার পাশ থেকে সরে এল। 'বইও এনে দেব, খেলনাও এনে দেব। একটু সময় বই পড়বে, একটু সময় খেলনা নিয়ে থাকবে। সেই ভাল, তাই ভাল হবে।' বলতে বলতে নীরদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কেমন আমার কথা দাদাবাবু রাখল তো, রাখবে না আবার, আমি যেমনটি বলব, দাদাবাবু তেমনি করবে, দিদি করে নি? আমার কথা ঠেলতে দিদি পর্যন্ত সাহস পায় নি।' গ্লাসটা বাবুর মুখের সামনে তুলে ধরে বুড়ী দাঁত বার করে হাসল। বাবু প্রথমটায় ঠোঁট ফাঁক করতে আপত্তি করল। তারপর কি ভেবে গ্লাসে চুমুক দেয়। ঢোক গিলে পরে হাসে। 'আমার কথাও তো রাখছে বাবা, শুনলে তো খেলনার সঙ্গে বইও আসছে। তবে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমারই জিৎ হল, ডবল জিৎ।' মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বুড়ী আবার গ্লাসটা বাবুর ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল। 'সবটা শেষ করে ফেল দিকিনি এইবেলা, আমার রাজ্যের কাজ পড়ে আছে ওদিকে। ভাত তো চাপিয়ে এলাম। ডাল মাছের ঝোল সব নামিয়ে দিতে পারব কি দাদাবাবুকে—'

'আমার মাছের দরকার নেই হরির মা।' যেন চৌকাঠের বাইরে

দাঁড়িয়ে নীরদ কথাটা শুনেছে। 'ডাল আর একটা কিছু ভাতে হলে চলবে। পরে তুমি মোড়ের বাজার থেকে যা হোক একটু মাছ এনে খোকাকে রেঁধে দিও, তুমি খেও। এখন তাড়াহুড়া করে অত-সব পারবে না।'

বাজারের কাজটা নীরদ অফিস ফেরার পথে সেরে আসে। মাছ শাক-সবজি খোকার জন্য ফল এটা-ওটা দরকার মতন কিছু সরু চাল এমন কি সন্দেশের হাঁড়িটা পর্যন্ত একটা রিক্শায় করে সঙ্গে নিয়ে নীরদ রোজ ঘরে ফেরে। কিন্তু কাল আর সে বাজার করে নি। মাঝে মাঝে এমন হয়। অগত্যা হরির মাকে সকালে বাজারে ছুটতে হয়। নীরদ এটা চায় না। কিন্তু না পাঠিয়ে উপায় থাকে না, বুড়ীর ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে নীরদ বোঝে, তা হলেও একটু ভাল মাছ, টাটকা শাক-সবজি খোকাকে দিতেই হবে। এবং যেদিন এ অবস্থা হয় সেদিন নীরদ একবারের জায়গায় তিনবার কথাটা বলে। 'খোকা খাবে, তুমি খাবে।'

ছুপুরে ঘরে ফেরা হয় না বলে বুড়ী এখানেই খায়। রাত্রে নিজের বাড়িতে খায়। এটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। তা হলেও দাদাবাবু যখন 'তুমি খাবে' কথাটা বলে হরির মা কেমন বিব্রত বোধ করে, লজ্জা বোধ করে। যেন বাজার করার অতিরিক্ত কাজটা তাকে করতে হচ্ছে বলে দাদাবাবু তার মন রাখতে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে খাওয়ার কথাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে, যেন না বললে সে বাজারে যাবে না।—ছি, ছি! বুড়ী মনে কষ্ট পায়। এই মন নিয়ে তো সে এখানে থাকে না, এই আত্মা নিয়ে তো সে রোগা ছেলেটার সেবা করছে না। নীরদ যখন আর একবার কথাটা বলে হরির মা বিরক্ত হয়, কষ্টটা রাগে পরিণত হয়। 'খাব গো খাব খাব, না বললেও খাব। জীবনভর তো খেয়ে খেয়ে এলুম, চুল পেকেছে, দাঁত

পড়েছে, চামড়া শুকিয়েছে তবু কি আমার পেটের আগুন নিভছে, রাবণের চিতের মতন জ্বলছে আর জ্বলছে—' বুড়ীর কথার ধরন দেখে বাবু হাসে। নীরদ অবশ্য এসব শুনতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নেই। তার মন অন্যত্র। চোখ দেখলে মনে হবে ভিতরে ভিতরে সে খুব অস্বস্তিবোধ করছে। প্রফুল্লকে একবার কলতলায় আসতে দেখল সে। নীরদের ইচ্ছা করছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা বলে। কিন্তু খামকা কথা বলার মতন আজ পর্যন্ত পরিচয়ই হল না চিন্তা করে নীরদ নিবৃত্ত হল। প্রফুল্ল হাত মুখ ধুয়ে কলতলা ছেড়ে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রফুল্লর স্ত্রী। 'ভীষণ অহংকার মহিলার।' নীরদ মনে মনে বলল, 'কতদিন আমাকে এই প্যাসেজ ধরে যেতে আসতে দেখেছে, কিন্তু একদিন তো চোখ তুলে মুখ তুলে তাকায় না। গায়ের ওই তো মেটে রং, মাংস বলতে কিছু নেই, তাতেই এত অহংকার। ভয় নেই, ভয় নেই, আপনার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই।' বলতে বলতে নীরদ ওদের দরজা পার হয়ে ঘোরানো সিঁড়ির মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। থুথু ফেলল নিচের দিকে তাকিয়ে। কাদের একটা কুকুর নিচে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁই কাঁই করছে। যেন কুকুরটাকে কেউ মেরেছে। আহত হয়ে কান্নাকাটি করছে ভয় পেয়েছে। চিন্তা করে নীরদ আবার ঘাড় ফিরিয়ে কলতলাটা দেখল। প্রফুল্লর স্ত্রী চলে গেছে। যেন কলটা খুলে গেছে। ছড়ছড় শব্দ হচ্ছে জল পড়ার। আরও কয়েক সেকেণ্ড সে ঘাড় কাত করে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ও এল। পিঠময় ছড়ানো চুল। যেন সকালেই কোন ফাঁকে স্নান করে গেছে মালা। পরনে একটা কালো চওড়া পাড় কাপড়। মন্থর গতি। হাতে একটা মগ। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে ভাবতে কলতলার দিকে এগোচ্ছে। আশ্চর্য সুন্দর ফরসা দুটি হাত। সাদা

শাড়ির সঙ্গে টিয়ে রঙের ব্লাউজটা কী চমৎকার মানিয়েছে। চিন্তা করে আস্তে আস্তে নীরদ সিঁড়ির মুখ ছেড়ে কলতলার দিকে এগোতে লাগল। তার হাতের মুঠোর মধ্যে সেই ভাঁজ করা ছোট্ট চিঠি। নীরদের বুকের ভিতর কেমন ডুবডুব শব্দ হচ্ছিল।

নয়

'সো আর্লি!'

'নো ব্রাদার।' সুধাংশুর চোখে চোখ রেখে নীরদ হাসল, তারপর নিজের হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল, 'নটা বেজে গেছে, নাইন সেভেন।'

'বোস বোস।' সুধাংশু নীরদের হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিল। 'এখান থেকে তোমার মিশন রো ড্যালৌসী যেতে আর কিছু একঘণ্টা লাগে না।'

'না, তা লাগে না।' নীরদ মৃদু হাসল। 'ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব, তাই একটু সকালে বেরোলাম। দাও সিগারেট দাও।'

সুধাংশু হলদে সিগারেটের টিন নীরদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'কাল কখন বাসায় ফিরলে?'

'হ্যাঁ, দশটা হয়েছিল।' নীরদ সত্য কথা গোপন করল।

'তা কাল অমন হুট্ করে নেমে গেলে কেন?' সুধাংশু হাত বাড়িয়ে টিন থেকে একটা সিগারেট তুলল। 'আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলে?'

'আরে রাম!' নীরদ সিগারেট ধরাল। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে শব্দ করে হাসল। 'তোমার সঙ্গে বসে ঐটুকুন খেয়েই কাল নেশা হয়েছিল আমার, টু-স্পীক দি ট্রুথ, তাই তো অত আবোল-তাবোল বকছিলাম!' নীরদ এবারও মনের কথা গোপন করল। সুধাংশু বুঝতে পারল না, বরং বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করে জোরে জোরে হাসল। 'আমি বুঝেছিলাম, আমি ঠিক ধরেছিলাম। তাই তো সেখান থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম তোমাকে নিয়ে। তবে গোড়ায় আমি একটা মস্ত ভুল করেছিলাম রাণু ভৌমিককে নিয়ে—'

'তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তা কি আমি বুঝিনি।' নীরদ এবার রীতিমত টেনে টেনে হাসতে লাগল। 'আমি জড়িয়ে গেছি ওর সঙ্গে এই তো, হা হা—কাল বাসায় ফিরে কথাটা মনে পড়ে আমার এমন হাসি পাচ্ছিল। আরে রাম! এ-বয়সে কি আর এসব হয়!' হঠাৎ হাসি থামিয়ে নীরদ চোখে মুখে একটা বৈরাগ্য-সূচক প্রশান্তি আনতে চেষ্টা করল।

কিন্তু সুধাংশু নিবৃত্ত হল না।

'সব বয়সেই সব হয়, ব্রাদার, বিশেষ প্রেমের ব্যাপারে—'

বন্ধুর ঠাট্টা নীরদ গায়ে মাখল না।

'না হে ব্রাদার, ইচ্ছা থাকলেও আমার উপায় নেই,—একটা মা-মরা রোগা ছেলে নিয়ে আমি যে কী ভীষণ বিড়ম্বনার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছি—'

এবার সুধাংশু গম্ভীর হয়ে গেল।

লক্ষ্য করে নীরদের ভাল লাগল। একটু একটু করে তার চেহারায় হাসি ফুটতে লাগল। সিগারেটটা দুবার জোরে জোরে টানল, তারপর সিগারেট নামিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'রোগা ছেলের

কথাও না হয় এক সময় ভুলে গেলাম, কিন্তু তোমাকে—' নীরদ থামল।

'অ, তা হলে আমার ভয়েই রাণুর সঙ্গে কিছু করা হচ্ছে না।' এবার সুধাংশু শব্দ করে হাসল।

'তাই তো, আমি যদি বলি তা ছাড়া আর কি।' নীরদ একটা বড় ঢোক গিলল, 'বাব্বা! কাল তোমার যা মিলিটাণ্ট এ্যাটিচুড় দেখলাম—সত্যি ভয় পাবার মতন কিনা ?'

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে সুধাংশু বলল, 'আমি কি মিথ্যে বলেছি,—বাস্তবিকই কি এসব নেষ্টি ব্যাপার চোখে দেখা দূরে থাক কানে এলেও মেজাজ খারাপ হয় না ? রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার জ্বলছিল তোমার ঐ চ্যাটার্জি সাহেবের কথা শুনে—লোফার, স্কাউণ্ড্রেল !'

নীরদ কথা বলল না। ঘাড় নামিয়ে হাতঘড়ি দেখল। যেন এখন উঠলে ভাল হয়। 'আমি এখন চলি ব্রাদার।' চোখ তুলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল সে কিন্তু কথাটা বলতে পারল না। নীরদ লক্ষ্য করল সুধাংশুর চেহারা কালকের মতন শক্ত কঠিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই একটা প্রসঙ্গ কেন বার-বার ঘুরে ফিরে দু-জনের মাঝখানে আসছে চিন্তা করে নীরদ কেমন অসহায় বোধ করতে লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে সে অন্য দিকে তাকাল।

ঈশ্বর সহায়। হঠাৎ সুধাংশুর মুখ বন্ধ হল। আলমারীর পিছন থেকে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল সুধাংশুর ডিস্পেন-সারীর সেই ছোকরা কর্মচারী। যেন কাঁদছিল সে এতক্ষণ। চোখ লাল।

'কি ব্যাপার, আমাদের লালু মহারাজের কি হ'ল।' অন্য একটা প্রসঙ্গ পেয়ে নীরদ প্রফুল্ল হল এবং সবটা মনোযোগ সে

লালু মহারাজ মানে লালমোহনের উপর ঢেলে দিয়ে শব্দ করে হাসল।

'ওকেই জিজ্ঞেস কর—কি হয়েছে।' সুধাংশু গম্ভীর হয়ে টিন থেকে নতুন সিগারেট তুলল।

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে মহারাজ, এসো, আমার কাছে এসো।' নীরদ ছেলেটিকে আদর করে ডাকল। বস্তুত সুধাংশুর এই বালক কর্মচারীটিকে সে ভালবাসে। বছর চৌদ্দ বয়স। শ্যামলা রঙ। বড় বড় চোখ। যেন কোথায় নীরদের ছেলের সঙ্গে একটা আদল রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারে না সে, তবু যখনই ছেলেটাকে দেখে নীরদের বাবুকে মনে পড়ে। খোকা একদিন এত বড় হবে। কিন্তু লালু যেমন সারাদিন ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়, সুধাংশুর ফাইফরমাশ খাটে, ঢিল ছুঁড়ে রাস্তার নিমগাছের মাথার কাক শালিক মারতে যায়, কুকুরকে তাড়া করে বিড়ালের ল্যাজের সঙ্গে কখনো ঝুমঝুমি কখনও বেলুন বেঁধে দিয়ে হি হি করে হাসে, তার খোকা কি এমন পারবে, মানে ততদিনে কি ও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে দু-পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবে? যেন এখন আবার কথাটা চিন্তা করতে করতে নীরদ লালমোহনকে আদর করে কাছে ডাকল। 'কি হয়েছে, নিশ্চয় আবার একটা দুষ্টুমি করেছিলে আর ডাক্তারবাবুর বকুনি খেয়েছ, কেমন তাই না?' নীরদ লালমোহনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বন্ধুর দিকে তাকায়।

'কুকুরের ওপর ডাক্তারি বিদ্যা ফলাতে গিয়েছিলেন তোমার লালমোহন মহারাজ।' সুধাংশু হাসল না। তেমনি গম্ভীর থেকে গেল।

'বটে!' নীরদ আড়চোখে আবার ছেলেটাকে দেখে। মুখ নিচু করে হাতের নখ খুটছে। 'কি করেছিল?' ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে

আস্তে নীরদ বন্ধুকে প্রশ্ন করল। এবং সেই সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। হাতের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলল, 'আমাকে এইবেলা বেরিয়ে পড়তে হয় সুধা।'

'হ্যাঁ, তোমার সময় হয়ে গেল।' সুধাংশু নিজের ঘড়ি দেখে 'পরে চোখ তুলল। 'কুকুরের ল্যাজে নাইট্রিক এসিড ঢেলে দিয়েছে তোমার লাল রাহাদুর।'

'কেন, কখন, কোথায়!' নীরদ অবাক হল।

'এই তো একটু আগে, একটা বাদামী রঙের কুকুর প্রায়ই আমার এই দরজাটার সামনে বসে থাকে, তুমি লক্ষ্য করে থাকবে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রিটার সঙ্গে কথা বলছি, সেই ফাঁকে শ্রীমান আলমারী থেকে এসিডের বোতল নামিয়ে এই কাণ্ড করল।' একটু থেমে সুধাংশু বলল, 'অথচ এসব শিশি বোতল আমি কত সাবধানে রাখি, কতবার বলে দিয়েছি খবরদার এসবে হাত দিবিনি।'

'আরে ওর হাতটাও পুড়ে যায়নি তো?' নীরদ ব্যস্ত হয়ে লালমোহনের দিকে তাকাল। 'কেন হঠাৎ তোর মাথায় এই দুষ্টামি এল লালু? নাইট্রিক এসিড কী সাংঘাতিক জিনিস তুই কি—'

নীরদের কথা শেষ হল না। সুধাংশু বলল, 'ওদিকে হুঁশিয়ার আছে। ও কি হাত দিয়ে তুলেছে নাকি এসিড! একটা ড্রপার চুবিয়ে খানিকটা তুলে নিয়ে কুকুরের ল্যাজে ছেড়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো তখন আমি আমার সিঁড়ির নিচে ওটাকে কাঁই কাঁই করতে দেখলাম। অনেকটা পুড়ে গেছে?'

'অনেকটা না পুড়লেও বেশ খানিকটা পুড়েছে। মাথায় দুষ্টামি এল ঠিক না, পরীক্ষা করে দেখল জন্তুর চামড়ার ওপর এসিডের অ্যাকশনটা কি—ডাক্তারী শেখার ওর ভয়ানক শখ কিনা।'

নীরদ এবার মৃদু হাসল। আনত মুখ লালুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'খবরদার আর কোনোদিন এসব করবে না।'

'কাল দেখি ওর হাতে একটা শিশি। এইটুকুন একটা শিশি। কার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়ে গেছে, খালি শিশি পড়ে ছিল তাই কুড়িয়েছে বুঝলাম। হঠাৎ দেখি আলমারীর ওপাশে দাঁড়িয়ে শিশিটা গায়ের জোরে নাড়ছে! কি ব্যাপার। ডাকলাম কাছে। দেখি রবারের ক্যাপটা খুলে ফেলে শিশির মধ্যে কি খানিকটা ঢুকিয়েছে। শুঁকে বুঝলাম ফিনাইল। তা অত জোরে নাড়া কেন! দেখি শিশির ভিতর শুধু ফিনাইল না। দুটো মাছি তিনটে পিঁপড়ে পুরেছে।'

নীরদ এবার শব্দ করে হেসে উঠল।

'মানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল কোন্‌টা বাঁচে কোন্‌টা মরে?'

সুধাংশু ঘাড় নাড়ল।

নীরদ বলল, 'তা আজকাল চারদিকে বিজ্ঞানীরা ইঁদুর গিনিপিগের ওপর নানারকম এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে, সুতরাং তোমার ডিস্পেনসারীর লালু মহারাজও চুপ করে বসে থাকছে না আর কি—' নীরদ থামল। সুধাংশু নীরব। লালু এইবার পায়ের নখ দিয়ে সিমেণ্টে ঘষছে।

'তোমার সেই যে পাশ করা কম্পাউণ্ডার আসার কথা ছিল তার কি হল?' নীরদ প্রশ্ন করল।

'কোথায় আর এল।' সুধাংশু ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। 'আর এসেই বা করবে কি, পসারের তো অবস্থাটা দেখছ—রুগী কোথায়।' সুধাংশু বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোকা অসহায়ের মত অল্প অল্প হাসে।

বন্ধুর এই চেহারাটা নীরদের ভাল লাগল। হাল্কা একটা নিশ্বাস ফেলে সে ঘুরে দাঁড়াল। 'জমবে, কেন জমবে না পসার, এই তো

সেদিন বসলে—যাক গে, আমি চললাম ব্রাদার, খবরদার লালু, ওষুধ পত্তর এসিড ফেসিডে হাত দিতে যেও না—চলি।' বলতে বলতে নীরদ চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। সুধাংশু এক দৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আজ নীরদ সন্ত পাট-ভাঙা সুট পরেছে, টাইটাও নতুন, যেন একটু আগে জুতোর পালিশ ফেরানো হয়েছে। কাল রাত্রে নীরদকে দেখে মনে হয়েছিল যেন সে কত বুড়িয়ে গেছে। আজ মনে হচ্ছে নবীন—যেন সুধাংশুর চেয়েও সে তরুণ রয়ে গেল। চিন্তা করে ডাক্তার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

দশ

'অদ্ভুত মেয়ে।' রমলা মনে মনে বলল, 'তোমার সঙ্গে তাল রেখে চলি আমার বাপের সাধ্য কি।'

বস্তুত রাগ করতে জিদ করতে ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে যেতে যেমন মালার জুড়ি নেই, তেমনি এক একটা সময় আসে যখন আদরে সোহাগে মমতায় মেয়ে যেন উপচে পড়ে। সেই আদর সোহাগের টাল সামলাতে রমলার প্রাণ যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেও মুখটা বিশ্রী করে রেখেছিল মালা, রমলা লক্ষ্য করেছে। চানটান করে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা একেবারে বদলে গেল। কি ব্যাপার! 'কিচ্ছু দরকার নেই বৌদি তোমার এখুন উনুনে এসে, সারাদিন তো ইস্কুলে গাধার খাটুনি আছেই—তার ওপর বাচ্চাটাকে দেখতে পার না একটু, যাও, ভীষণ কাঁদছে, তুমি গিয়ে একটু দুধ দাও, আমি সব সামলে নেব। আর

কি চায়ের জল ফুটে গেছে, কেটলি নামিয়ে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দেব। আমি—' বলতে বলতে বোধ করি ভিজে শাড়ি ওদিকের রেলিং-এ ছড়িয়ে দিতে মালা ছুটে গেল।

রান্না করতে রমলা আসেনি যদিও, কালকের ঘটনার পর সকালে উঠেই ওর হাতের তৈরি চা খেতে কেমন বিতৃষ্ণা লাগবে চিন্তা করে রমলা শুধু জলটা ফুটিয়ে নিতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল।

কিন্তু মালা তা-ও বৌদিকে করতে দিতে রাজী নয়! অল্প হেসে রমলা নিজের ঘরে চলে এসেছে।

'হাসছ কেন?' প্রফুল্ল প্রশ্ন করেছে।

'এমনি।' রমলা বাচ্চার মুখে স্তন দিতে ব্লাউজের বোতাম খুলেছে। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে প্রফুল্ল পরে বিড়ি টানতে চোখ বুজেছে।

এমন সময় মালা দু বাটি চা হাতে করে ঘরে ঢুকল। চা থেকে ধোঁয়া উঠছে। মালার মুখখানা হাসি-হাসি। ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো। পরনের কাপড়টা ফরসা। গায়ে যে ব্লাউজ উঠেছে তার রঙটা অন্য দুটো ব্লাউজের চেয়ে দেখতে ভাল। সব মিলিয়ে এমন স্নিগ্ধ সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল ও যে প্রফুল্ল খুশি হল। প্রসন্ন মুখে রমলা হাত বাড়িয়ে চায়ের বাটি তুলে নিল। 'তোমার চা রেখেছ তো?' বৌদির চোখে চোখ রেখে মালা শুধু ঘাড় কাত করেছে। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

'আজ মেজাজটা ওর ভাল দেখছি।'

প্রফুল্লর দিকে ঘুরে বসে রমলা চায়ের বাটিতে লম্বা চুমুক দিয়েছে। তারপর, 'তাই হাসছিলাম, তোমার বোনের মতিগতি বোঝা আমার সাধ্য না।'

'খুব স্বাভাবিক।' প্রফুল্ল হাসল না। 'ওর মনের অবস্থাটা

তুমি বিবাহিত মেয়ে হয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা আন্দাজ করতে পার। আমাদের শাস্ত্রের কথা পতিই সতীর গতি—কাজেই…' বিড়বিড় করে প্রফুল্ল পরের কথাগুলো কি বলল ভাল শোনা গেল না।

ওদিকে রান্নাঘরে গুনগুনিয়ে গান গাইছিল মালা আর চটপট হাত চালিয়ে এটা ওটা সেরে নিচ্ছিল।

এক সময় বেলা হল। রমলা চান করল, প্রফুল্ল চান করল। দুজনকে এক সঙ্গে ভাত খেতে দিয়ে মালা বাচ্চাটাকে চান করিয়ে জামা কাপড় পরিয়ে চোখে কাজল বুলিয়ে গলায় মুখে পাউডার মাখিয়ে রমলার কাছে নিয়ে এল। খাওয়া সেরে রমলা ততক্ষণে কাপড় পরছে। প্রফুল্লর কাপড় পরা হয়ে গেছে। বিড়ি টানছে। বাচ্চাটা মালার কোলে থেকে একবার বাবার দিকে একবার মার দিকে ছোট্ট হাত দুটো বাড়িয়ে 'বা' 'মা' করছে আর খিলখিল করে হাসছে। সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ কেটে রমলা হাতে ব্যাগ তুলে নিল। বাচ্চা এইবেলা বুঝতে পারে মা এখন বেরোচ্ছে। আরম্ভ করল কান্না। প্রফুল্ল মালার কোল থেকে বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে আদর করল চুমু খেল। কিন্তু কান্না থামে না। রমলা বাইরের পোশাক পরার পর ছেলেকে কোনদিনই কোলে নিতে চায় না। পাছে শাড়ি ব্লাউজ নোঙরা করে ফেলে এই ভয়। আলগা থেকে শুধু গলা বাড়িয়ে দিয়ে শিশুর দিকে তাকিয়ে আদর জানাল চুমু খাবার ভঙ্গিতে দুই ঠোঁট সরু করে 'চুক' 'চুক' শব্দ করল। কিন্তু তাতে কি সন্তান ভোলে। কান্নার বেগ আরো বেড়ে যায়। 'তুমি থাকো বাবা, পিসি-মার কাছে থাকো, পিসিমা তোমায় কত আদর করে কি সুন্দর করে চোখে কাজল পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। কিচ্ছু ভয় নেই, আমরা কাজে যাই, সকাল্ সকাল ফিরে আসব, তারপর তোমায় সারা সন্ধ্যা সারা রাত বুকে নিয়ে আদর করব।' বলতে বলতে রমলা সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে তাকায়। 'চলো, বেলা হল।' প্রফুল্ল ছেলেকে মালার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'চলো।' তারপর তুজন একসঙ্গে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মালা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায়। একটু সময়। তুজন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে আবার ও ঘরে ফিরে যায়।

একটানা আধঘণ্টা কেঁদে কেঁদে শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাটিতে একটু তুধ গরম করে খাইয়ে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল। মালা ওকে শুইয়ে দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত। শিশুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে কাপড় খুলে গিয়েছিল। কাপড় ঠিক করতে মালা বৌদির বড় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ব্লাউজের ভিতর থেকে টুক করে ডাক টিকিটের মতন ভাঁজ-করা চিঠিটা মেঝের ওপর পড়ল। ওটার কথা এতক্ষণ ভুলেছিল ও? মোটেই না। কতক্ষণে দাদা বৌদি বেরিয়ে যাবে তার অপেক্ষায় ছিল। নিজের মনে মুচকি হেসে নুয়ে মালা চিঠি কুড়িয়ে নেয়। বুকের ভিতরটা কাঁপছে। আঙুলগুলো কাঁপছে। এমন নয় যে আজ এই প্রথম চিঠি সে নীরদের কাছ থেকে পেয়েছে। অনেক চিঠি পেয়েছে এই তিনমাসে, অনেক চিঠি সে নীরদকে লিখেছে। সবগুলোই যে প্রমাণসাইজ চিঠি তা নয়। অধিকাংশই খবর পাঠানো খবর নেওয়ার মতন এক কথা তু'কথায় তাড়াতাড়ি করে লেখা এক টুকরো কাগজ। কখনো পেন্সিল দিয়ে কখনো কলম দিয়ে লেখা। 'কাল এত রাত হয়েছিল কেন?' 'আজ সকালে বৌদির সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হ'ল।' 'একটু আগে আমি বারান্দায় গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনার দেখা পাইনি—রান্নার তাড়া ছিল তাই অপেক্ষা করতে পারিনি।'—এই সব। চুরি করে লেখা চুরি করে দেওয়া চুরি করে পড়া এর প্রশ্ন ওর উত্তর। কিন্তু তার মধ্যেও উত্তেজনা কম থাকে না। আজ বড় চিঠি হবে ভাঁজ করা

কাগজটা হাতে তুলে মালা টের পেল। তাই বুকটা দুরদুর করছে। বিশেষ কাল রাত্রের সেসব কথার পর আজ সকালেই এই চিঠি। ভাঁজ খুলল। একটা দুটো তিনটে। আর এক ভাঁজ। সবটা চিঠি খোলা হয়ে গেলে পর মালা রুদ্ধশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করল। একবার পড়া হয়ে গেল। যেন কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। আবার পড়ল। এবার কথাগুলোর অর্থ কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সব পরিষ্কার হচ্ছে না। আর দাঁড়িয়ে নয়, আয়নার সামনে থেকে সরে এসে সে রমলার খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরল। বেশ কিছুটা সময় দিয়ে সে এবার সবটা পড়ে শেষ করল। এতক্ষণ মালার চোখের রঙ উজ্জ্বল কোমল স্বাভাবিক ছিল। চিঠির সব কথার অর্থ পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলে উঠল। আঁচল দিয়ে মালা কপালের ঘাম মুছল। একটা মাছি বারবার ঘুরে ফিরে রমলার বাচ্চার মুখে এসে বসছিল। ঘাম মোছা আঁচলটা নেড়ে সে মাছিটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল। অবশ্য ভাল করে তাড়াতে তার হাত উঠছিল না। যেন হাতটা তার নিজের আয়ত্তের মধ্যে নেই। আপনা থেকে সেটা কখন স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। মেরুদাঁড়া টান করে বসে মালা বাঁ হাতে ধরা চিঠিটার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল। চিঠির ভাঁজ খোলার সময় তার ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল। এখন নিশ্বাস মন্থর গাঢ়। দেখে হঠাৎ মনে হবে বুঝি বা নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। এটা বাইরের লক্ষণ। কিন্তু ভিতরে? বুকের ভিতর আগুনের ঝড় বইছিল তার। আর সেই আগুনে চিঠির প্রত্যেকটা যুক্তি সান্ত্বনা উপদেশ আশ্বাসকে পুড়িয়ে সে ছাই করে দিতে লাগল। কিন্তু সবগুলো কথা যেন পুড়েও পুড়ছিল না, শক্ত হাড়ের টুকরো হয়ে, পাথরের টুকরো হয়ে, ছোট ছোট ইস্পাতখণ্ড হয়ে আগুনের সঙ্গে যুঝছিল: 'হঠাৎ তোমার এতটা

অস্থির হবার কারণ নেই। তুমি তো আর বিপদে পড়নি। বিপদ বলতে আমি কি বুঝি তুমি নিশ্চয় বুঝে থাকবে। সুতরাং আজই অস্থির না হয়ে চঞ্চল না হয়ে ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে আমাদের এগোতে হবে, সব কিছু করতে হবে। একটা বড় প্রশ্ন তোমার স্বামী জীবিত। কোর্টে গিয়ে এই বিয়ে রদ করা যায়। অবশ্য তার হাঙ্গামা অনেক। তোমার স্বামীর এতে মত আছে কিনা, যদি না থাকে স্বামী তোমার ওপর অত্যাচার করে, তোমাকে খেতে পরতে দেয় না এসব প্রমাণ তথ্য সাক্ষীসাবুদ আদালতে উপস্থিত করতে হবে। এভাবে যদি বিয়ে রদ করা যায় তবে আর আমাদের তুজনের একত্র বাস করতে বাধা থাকে না। কিন্তু সেটা এখনই সম্ভব হচ্ছে কি? অনেক অসুবিধা। তুমি চিন্তা করে দেখ। তবে আর কি উপায় আছে? তোমায় নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া! কিন্তু সে আরও বিশ্রী। পুলিশ পিছনে লাগবে। চোরের মতন পালিয়ে ক'দিন থাকা যায়। তা ছাড়া কাজকর্ম না করলে খাওয়া-পরাও তো চলবে না। বরং এখন এখানে আমরা যে ভাবে আছি সেইটে সবচেয়ে নিরাপদ। তোমার দাদা তোমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন না, তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই যে সেকথা ভেবেও তুমি অস্থির হবে। সুতরাং আমার মনে হয়, সব এখন সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে তু'জনের অপেক্ষা করা ভাল। কোনো অসুবিধা হবে না। কাজেই—বাস্তবিক কাল তোমার হাবভাব দেখে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, আমার কেবল ভয়, রাত্রে ঘুম হয়নি এই ভেবে, বুঝি তুমি বড় রকমের বিপদে পড়েছ।'

'ভীরু কাপুরুষ!' মালা নিজের মনে বলল, 'আমি তেমন লেখাপড়া শিখিনি। কিন্তু শিক্ষিত মানুষ তোমার চিঠির এই নমুনা? এই ভাষা!' মালার শরীর মন ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো।

টুকরো টুকরো করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল। বলল, 'আমার রাগ করার অভিমান করার গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরার এই অর্থ তুমি আবিষ্কার করলে। বুদ্ধিমান বটে!' অস্থির উত্তেজনায় মালা উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে তাকের ওপর থেকে দেশলাই টেনে এনে চিঠির টুকরোগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। 'যাক সব পুড়ে খাক হয়ে যাক। এ সবের কোনো চিহ্ন আমি রাখতে চাইনে!' বলল আর স্থির অপলক চোখে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। মালার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। মোটা ধারায় চোখের জল ফেলে কান্না। কিন্তু তা না হলে কি। সব সময় তো চোখে জল আসে না। তার বুকের ভিতর কান্নার ঢল নেমেছে। তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে কাঁদছে: 'এই শর্ত সামনে রেখে তোমার ভালবাসা! বলো ভালবাসার খেলা। যতক্ষণ না তোমার সন্তান আমার গর্ভে আসছে ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্ত নির্বিকার স্বাধীন? বটে, আজ তোমার আইনের ভয়, পুলিশের ভয়! কিন্তু যদি একদিন আমার সে রকম কোনো বিপদে পড়তে হয় সেদিন তুমি সব ভয় সব দুর্ভাবনা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার দায়িত্ব মাথায় পেতে নেবে কি? নেবে না তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে। না হলে তিনবার চিঠিতে সতর্ক সাবধান হুঁশিয়ার কথাটা লাগাচ্ছ কেন।' মালার চোখের ওপর থেকে একটা ঠুলি সরে গেল। এখন সে পরিষ্কার তার নিকট ও দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। দেখছে নীরদকে—নীরদ নামধারী এক পুরুষের বিশ্বাসঘাতক মনকে। 'আইন—আইনের ভয়! যেদিন আমার গায়ে হাত দিয়েছিলে সেদিন আইনের কথা মনে ছিল না কাপুরুষ!' বলল মালা, বলতে বলতে সে রমলার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। তার পা টলছিল মাথা ঘুরছিল। কুঁজো থেকে ঘটিতে জল গড়িয়ে নিয়ে সে মাথায় ঢালতে লাগল।

অনেকক্ষণ ঢালল। মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েছে যখন বুঝতে পারল দরজা ছেড়ে সে কোনরকমে নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। মাথাটা আঁচল দিয়েই মুছল। তারপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। এবার চোখ বুজে মালা চিন্তা করতে লাগল। 'আমার ভুল—আমার ভুল হয়েছে, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার চিঠিতে তুমি সেকথা একবার স্বীকার করছ না তো যে যা হবার হয়েছে, আর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই। এখানেই এর শেষ হোক। শেষ হওয়াই তো ভাল। এর পরিণাম যখন এমন ভয়ংকর তখন—হ্যাঁ, আমি বুঝিনি, আমার এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে আজ যা এত সুখের এত তৃপ্তির কাল তা বিষের মত ঠেকবে। সব মন্দ সব বিষ অমৃত হয়ে উঠবে মেনে নিয়ে আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি ডাক্তাররা যেমন নিজেদের শরীরে টিকা নিয়ে ইঞ্জেকসন নিয়ে বা রোগ না হতে পারে এমন ওষুধপত্র খেয়ে পরে রুগী হাতাতে আসে তুমি সেভাবে সতর্ক হুঁশিয়ার হয়ে আমার-কাছে আস, এসেছ।' চিন্তা করে এবার মালার চোখের কোণ বেয়ে জল পড়তে লাগল। 'আজই আমি সন্তান হোক চাইছি না। হয়তো কখনো চাইতাম না। কিন্তু সেটা ভয়ংকর অবৈধ। এবং এটা কখনও ঘটবে না এই শর্ত, শুধু এই শর্ত সামনে রেখে যে-পুরুষ একটি মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নেয় সে কুৎসিত লম্পট পশু। তোমার চিঠি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। না হলে, এত সান্ত্বনা এত সাবধান বাণী শোনাবার পর আজ আবার লিখতে না, রাত বারোটার সময় প্যাসেজে থেকো। এটা খুব বৈধ কাজ হচ্ছে, কেমন ?'

অনেকক্ষণ একভাবে নির্জীবের মতন পড়ে রইল মালা। বেলার মনে বেলা গড়িয়ে গেল। রান্নাঘরে বাড়া ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে

হয়ে আছে মনে পড়তেও উঠে গিয়ে খেতে ইচ্ছা করছিল না তার। ওধারে রাস্তার নিম গাছটায় পাখির কলরব শুরু হয়েছে যখন শুনতে পেল তখন সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর তখন মালার চেহারা যে দেখত সে ভয় পেত। সকালে স্নান করে চমৎকার খোঁপা বেঁধেছিল। তার আর কোন চিহ্ন এখন নেই। কপালে গালে গলায় পিঠে কালো কোঁকড়া চুলের রাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু চুপ করে নেই তারা। গলা বাড়িয়ে ফণা তুলে যেন হাজারটা কালো বিষধর সাপ অবিশ্রাম ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। আর সেই সব ভয়াল ফণার মাঝখানে মালার চোখ দুটো জ্বলছে। শুধু দাহ না শুধু জ্বালা না, যে আগুন জ্বেলে নারী জগত সংসার পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সেই ভয়ংকর আগুন সহস্র শিখা হয়ে মালার চোখে জ্বলছে। এত আগুন তার চোখে আছে মালা নিজেও যেন জানত না। দেয়ালে টাঙ্গানো ছোট আরশিটায় চোখ পড়তে ও চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোকে ও শান্ত করল। থাক, এখনই তো আর সব আগুন সে কাজে লাগাচ্ছে না, ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখবে। বরং এখন আরশি থেকে চোখ সরিয়ে ও দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারে এ-মাসের একটা তারিখ খুঁজতে লাগল। পেয়ে গেল। আলপিনের সূক্ষ্ম আঁচড় বুলিয়ে তারিখটাকে সে নিজের হাতে চিহ্নিত করে রেখেছিল। তারিখ দেখা শেষ করে মালা নিজেকে দেখতে লাগল। নিজের আত্মা না মন না হৃদয় না। শুধু শরীর। কেবল শরীরের সঙ্গে যৌবনবতী নারীদেহের রক্তমাংস মেদমজ্জার সঙ্গে মাসের একটা তারিখের এত মিল এমন গূঢ় সম্পর্ক যেন নীরদের চিঠি পড়ার আগে মালার জানা ছিল না। জানা ছিল, কিন্তু এর সঙ্গে এত উদ্বেগ এত দুশ্চিন্তা এত আতঙ্ক জড়িয়ে আছে মালা বুঝত না। এখন বুঝল। না, দুশ্চিন্তা আতঙ্ক মালার না,

একটি পুরুষের। নীরদের। ভাল ভাল। আলপিনের আঁচড় কাটা মাসের সেই বিশেষ তারিখ ও নিজের শরীর দেখে যখন ও শেষ করল তখন সাপের জিহ্বার মত চিকন একটা হাসি তার পরিপুষ্ট অধরোষ্ঠের মাঝখানে চকিতে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল। 'ভাল ভাল, তোমার আতঙ্ক দিয়ে আমি তোমাকে মারব। আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ভেবেছিলে তার তাপে তুমি হাত সেঁকবে পা সেঁকবে—না, আর একটু বেশি,—' কার সঙ্গে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায় চিন্তা করতে করতে উপমাটা মালা আবিষ্কার করল ঃ 'নরম পায়রার মাংস পাক করার মতন তাপ হলেই তোমার হয়, তার বেশি চাই না, মাংসটুকু উদরসাৎ করে নিটোল এক ঘুমে রাত শেষ করে দিয়ে পরদিন হৃষ্টমনে অফিস করতে যাবে। শুধু এই। শুধু এই? তুমি কি জান না মূর্খ সেই আগুন আমার হাড় পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে, আমার আত্মাকে কালো করে ফেলছে।'

শিশুটা কেঁদে উঠল। মালা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। কলে জল এসে গেছে। আসুক। এই দেয়াল থেকে সেই দেয়াল পর্যন্ত মালা পায়চারি করছে। ঢিলেঢালা বসন। বিশ্রস্ত চুল। পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘিনীর মতন ক্ষোভে আক্রোশে সে ছটফট করছে।

এগারো

ঝরঝর করে বৃষ্টি নামল আর লোকটা ছুটে এসে ভিতরে ঢুকল। সুধাংশু মনোযোগ দিয়ে একটা মেডিকেল জার্নাল পড়ছিল। অনেকক্ষণ থেকে দিনটা অন্ধকার হয়ে আছে বলে লালু ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মত আলো জ্বেলে দিয়েছে। লোকটা ভিতরে ঢুকতে সুধাংশু

কাগজ থেকে চোখ তুলল। তৈলহীন রুক্ষ চুল শুকনো চেহারা এবং আগন্তুকের বেশভূষাও অত্যন্ত মলিন। সুধাংশু লক্ষ্য করল জুতোয় কাদার দাগ লেগে আছে। শহরতলী বা আশে পাশের কোন গ্রাম থেকে এসেছে হয়তো সুধাংশু অনুমান করল। বুক খোলা একটা কোট গায়ে। নিচের গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে। ঘামে ময়লায় এমন রং ধরেছে যে দেখে আপনা থেকে সুধাংশুর নাক কুঁচকে গেল। কাপড়ের কোঁচাটা ঘুরিয়ে এনে কোটের পকেটে ঢুকিয়েছে। বাঁ হাতের আঙুলে একটা রূপোর আংটি। গ্রহশান্তির জন্য এটা পরা। আংটির মাথায় তেঁতুল বীচির রঙের পাথরটা দেখে সুধাংশু অনুমান করল। লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে পরে সুধাংশুর টেবিলের পাশে চেয়ারের কাছে দাঁড়াতে সুধাংশু হাত তুলল, আঙুল দিয়ে ওধারের দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো বড় বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিল। 'ওপাশে বসুন।'

'কেন বলুন তো', আগন্তুক সরাসরি সুধাংশুর চোখের দিকে তাকাল। 'আমি কি চেয়ারে বসতে পারি নে। আরে মশাই, আমিও ভদ্দরলোকের ছেলে।'

কথা যেমনই হোক লোকটার গলার স্বরে এমন একটা ঔদ্ধত্য ছিল যে সুধাংশু অবাক হল, ক্রুদ্ধ হল।

'ভদ্রলোক ছোটলোকের কথা হচ্ছে না। রুগীদের বসবার জায়গা ওটা—এখানে না।'

এবার নাকের শব্দ করে লোকটা হাসল।

'আমি রুগী আপনি কি করে বুঝলেন?'

'আচ্ছা, আপনি রুগী না হন রুগীর জন্য ওষুধ নিতে এসেছেন এই তো? ঐ একই কথা, ওখানে বসুন।' সুধাংশু আঙুল দিয়ে আবার বেঞ্চিটা দেখাল।

কোটের পকেট থেকে ভয়ংকর অপরিচ্ছন্ন একটা রুমাল বার করে আগন্তুক কপাল মুছল। যেন রুমাল এখনি দুর্গন্ধ ছড়াবে অনুমান করে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে সুধাংশু শক্ত হয়ে বসে রইল।

'মশাই, সাধে কি আর বলে আপনারা কলকাতার ডাক্তাররা জ্যান্ত মানুষকে ধরে ধরে মেরে ফেলেন। এক লিভারের পেইন ছাড়া চৌদ্দ বছরের মধ্যে আমার কোনো রোগ হয়েছে বলে তো জানা নেই। বাড়িতে রুগী? তা বলতে পারেন। বুড়ো বাপ বাতে ভুগছে, ভুগছে মানে বিছানাই নিয়েছে আজ সাত বছর। কিন্তু বাবার জন্য কি আর আপনাদের মত পাশ-করা ডাক্তারদের কাছে আসব ভেবেছেন? আরে মশাই মেডিকেল জগতের খবর টবর আমরাও এক আধটু রাখি। ওই কোবরেজী তেল। এ ছাড়া বাতের দাওয়াই কোনো চাঁদ ডাক্তার তো আজ পর্যন্ত বার করতে পারলো না। বলবেন ইঞ্জেকশন। আরে সে খবরও রাখি মশাই। ইঞ্জেকশনে ক ঘণ্টার জন্যে বাত সারে কদিন দাবিয়ে রাখতে পারে আপনি নিজে ডাক্তার হয়ে একবার বুকে হাত রেখে আমায় বলুন তো? বাতের হল গিয়ে তেল। চড়ক মুনি থেকে আরম্ভ করে আজকের আপনাদের চুনাপুকুরের চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার রাধারমণ চক্রবর্তী পর্যন্ত তেল মালিশের ব্যবস্থা দিচ্ছে। মিছা বলছি?'

'আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন।' যতটা সম্ভব সংযত থেকে গম্ভীর গলায় সুধাংশু বলল, 'তা হলে কি চাই আপনার, কোথা থেকে এসেছেন?'

'আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে বরানগরের বাসিন্দা মশাই, চল্লিশের সি চিন্তামণি ঠাকুর লেন আমার ঠিকানা, গোপন করার কিছুই নেই। আমার নাম শ্রীমাণিক দাস। আমার বাবার নাম শ্রীযুত প্রতাপ দাস।'

চুপ থেকে সুধাংশু টিন থেকে একটা সিগারেট তুলল।

লুব্ধ চোখে টিনটার দিকে তাকিয়ে মাণিক দাস বলল, 'চুপ করে গেলেন কেন, আমার বংশ পেশা এসবও জিজ্ঞেস করুন, মনে করেছেন রাস্তার একটা যা-তা লোক আপনার ডিস্পেন্সারীতে এসে ঢুকল।'

এবার সুধাংশুর হাসি পেল।

'না না তা ভাবব কেন, তা ভাবিনি, মশাইয়ের এখানে দরকারটা কি জানতে দোষ আছে কিছু?'

'বলব বলছি।' অনুমতির অপেক্ষা না করে মাণিক দাস সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'আমরা কায়স্থ মশাই, নিজেও কিছু বেকার বাউণ্ডুলে নই। বরানগর উর্বশী সিনেমা হলের নাম শুনেছেন কিনা জানি না। আমি তার অপারেটার।'

'ভাল।' মৃদু শব্দ করে সুধাংশু সিগারেট টানতে লাগল। এবং এবারও দেখা গেল অনুমতির অপেক্ষা না করে মাণিক দাস টিন থেকে দিব্যি একটা সিগারেট তুলে নিল। অদূরে একটা কাঠের বাক্সের ওপর উপবিষ্ট সুধাংশুর বালক কর্মচারী লালমোহন কটমট করে মাণিক দাসকে দেখছিল। না বলে ডাক্তারবাবুর টিন থেকে লোকটাকে সিগারেট নিতে দেখে লালমোহন অস্ফুট শব্দ করে কি যেন বলল এবং মেরুদাঁড়া টান করে শক্ত হয়ে বসল। লালু চটে গেছে লক্ষ্য করে সুধাংশু মৃদু হাসল। মাণিক দাস এসব কিছুই লক্ষ্য করল না। সিগারেট ধরানো শেষ করে সুধাংশুর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনাদের এটা চুরাশি নম্বরের বাড়ি তো?'

সুধাংশু ঘাড় নাড়ল।

'দোতলা বাড়ি মনে হচ্ছে', মাণিক দাস প্রশ্ন করল, 'ওপরে অন্য সব লোক ভাড়া নিয়ে আছে, কেমন তাই না?'

'তা আপনি কি ওপরের কোনো লোকের কাছে এসেছেন, না

আমার কাছে আপনার দরকার? হ্যাঁ, ওপরে অন্য সব ভাড়াটে আছে।'

ডাক্তারকে হঠাৎ আবার বিরক্ত হয়ে উঠতে দেখে মাণিক দাস চমকে উঠল, তার হাতের সিগারেট নড়ে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আহা রাগ করবেন না, রাগ করবেন না,—ওপরে প্রফুল্ল রায় আছে না? টি মার্চেন্ট, বৌবাজারে দোকান?'

'হ্যাঁ, আছে।' সুধাংশু হাত দিয়ে তার ডান পাশের জানালাটা দেখাল। 'ওপরে যাবার রাস্তা ওদিক দিয়ে। বেরিয়ে চলে যান।'

'তা তো যাব মশাই, কি রকম জোরে জল হচ্ছে দেখছেন তো।' মাণিক চেয়ার ছেড়ে উঠবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে মনের সুখে সিগারেট টানতে লাগল। তখন প্রচণ্ড শব্দ করে বৃষ্টি হচ্ছে। এক মিনিট চুপ থেকে পরে মাণিক দাস অল্প শব্দ করে হাসল। 'আমি প্রফুল্ল রায়ের ভগ্নীপতি,—হ্যাঁ, মালার স্বামী, এখন এখানেই আছে ও কিছুকাল, দেখেছেন কিনা জানি না।'

সুধাংশু হ্যাঁ না কিছু বলল না। কিন্তু ওপাশে লালু কাঠের বাক্স থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল আর যেন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে চোখমুখের এমন ভাব করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: 'ও! মালাদির বর আপনি, মালাদির—' বলে ছুটে দরজার কাছে চলে গেল। যেন তখনি সে বেরিয়ে যেত, জল দেখে থমকে দাঁড়াল।

'কি হয়েছে, কোথায় যাচ্ছিস।' সুধাংশু গম্ভীর গলায় ডাকল। 'এদিকে আয়।'

লালু যেমন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠেছিল তেমনি আবার হঠাৎ মুখ কালো করে ফেলল। বস্তুত একটু সময়ের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল

ডাক্তারবাবু এখানে বসে আছেন। তাকে দেখছেন। লোকটি মালার বর শোনামাত্র সে ছুটে বেরিয়ে ওপরে খবর দিতে চলছিল। তার কারণ আছে। দুপুরের দিকে ডাক্তার যখন ডিস্পেন্সারীতে থাকে না, তখন প্রায়ই মালা নিচে নেমে এখানে আসে। উদ্দেশ্য লালুকে দিয়ে আলুর চপটা চানাচুরটা কি দরকার মত সাবানটা তেলটা দোকান থেকে আনানো। সেই সঙ্গে মালার সঙ্গে লালুর সম্পর্কটা বেশ গাঢ় হয়ে গেছে। খাবার কিছু কিনে আনলে মালাদি তাকে ভাগ দেবেই। আর একটা কথা, মালাদির বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে না, এখানে দাদার বাসায় মাসের পর মাস কাটাচ্ছে একটু একটু বুঝতে পারার মতন সাবালক হয়েছে লালু। তা ছাড়া ডিস্পেন্সারীতে ঢুকে অধিকাংশ দিনই মুখ কালো করে মালাদি যে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে লালু লক্ষ্য করেছে। তাই আজ এখন মালার বরের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব সুধাংশুর খুদে কর্মচারীটিকে অতিমাত্রায় চঞ্চল ব্যস্ত করে তুলেছিল। দরজা থেকে সরে এসে লালু তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসতে সুধাংশু মাণিক দাসের দিকে চোখ ফেরাল।

‘বৃষ্টি এখনি ধরবে, আপনি ওপরে গিয়ে খোঁজ নিন।’

‘তা নেওয়া যাবে, আর খোঁজ নেওয়ার আছে কি—চুরাশি নম্বরের বাড়ি আমি তো ঠিকানা জানি। এখন কথা হচ্ছে কি—’ কি যেন বিড়বিড় করে পরে মাণিক প্রশ্ন করল, ‘প্রফুল্লবাবু বাড়ি আছেন খবরটা দিতে পারেন কি? না কি দোকানে চলে গেছেন। আপনি যদি বাচ্চাটাকে একবার ওপরে পাঠিয়ে—’

উৎসাহে লালুর চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠল। কিন্তু ডাক্তারবাবুর চেহারায় সেরকম কোনো অনুমোদন না দেখে লালমোহন আসন ছেড়ে উঠতে পারল না।

মাণিকের কথা শুনে সুধাংশু ঠোঁট বেঁকিয়ে ঈষৎ হাসল।

'আমার বাচ্চাকে আর পাঠিয়ে দরকার কি। আপনি যখন এবাড়ির জামাই সরাসরি ওপরে চলে যান, কে আপনাকে আটকাচ্ছে। এই তো বৃষ্টিটাও ধরল যেন।'

কিন্তু তাতে মাণিকের উৎসাহ বাড়ল বলে মনে হল না। বৃষ্টি দেখতে দরজার দিকে ঘাড় না ফিরিয়ে বরং সুধাংশুকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল আর জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল। যেন মাণিক দাস ভাবনায় পড়েছে। লক্ষ্য করে সুধাংশুর মন্দ লাগছিল না। কেননা প্রফুল্ল রায়ের বোন সম্পর্কে দু একটা কথা তার কানে এসেছে। নীরদের ছেলেকে দেখতে তার রোজ একবার ওপরে যেতে হয়। প্যাসেজে কি দোতলার সিঁড়ির মুখে অথবা পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় মালাকে সেব দুবার।দেখেছে। একদিন কথায় কথায় নীরদের ঝি হরির মার মুখে সুধাংশু জানতে পারল মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু স্বামী মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন ভাইয়ের সংসারে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই পর্যন্ত। স্বামী তাড়িয়ে দিল কেন, লোকটার স্বভাব চরিত্র কেমন বা মেয়েটির কিছু দোষ আছে কিনা ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই সুধাংশু আজ পর্যন্ত কাউকে করেনি। করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখন বরানগরের মাণিক দাসকে দেখে হরির মা'র কথা সুধাংশুর মনে পড়েছে। প্যাসেজে বা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মালাকে তার মনে পড়ল। মেয়েটি সুন্দরী।

'যান বৃষ্টি ধরে গেছে।' সুধাংশু এবার আর ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'ডান দিকের প্যাসেজ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই ঘোরানো সিঁড়ি পাবেন। বাঁ দিকের ফ্ল্যাট।'

মাণিক পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে ফেলল।

'প্রফুল্ল রায় বাড়িতে না থাকলে আমার ওপরে যাওয়া চলবে না।' 'সে কি কথা, আপনি—' বলতে বলতে সুধাংশুও থেমে গেল।

'হ্যাঁ, এবাড়ির জামাই, আইনতঃ এখনো তাই আছি।' মাণিক দাস ফ্যাকাশে একটুখানি হাসল। 'কিন্তু ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ভাল নেই মশাই।'

'কেন' প্রশ্ন করতে সুধাংশুর রুচিতে বাধল। খুঁতখুঁতে মানুষ। চুপ করে রইল। কিন্তু মাণিক চুপ করে থাকতে পারল না। যেন ভিতরে অনেক ক্ষোভ আছে অভিযোগ আছে এমন ভাবে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল, গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার করল, চেয়ারের পিঠে মাথাটা একবার ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার ঘাড় সোজা করে বসল; তারপর হাতের শীর্ণ শুকনো আঙুল দিয়ে টেবিলটা দুবার ঠুকে মাণিক নীরস গলায় বলল, 'মশাই, কথায় আছে না, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। প্রফুল্লর বোনের অবস্থা হয়েছে তাই। না হলে বিয়ের পর ছ মাস না পেরোতে আমি ওর হাতের চুড়ি গড়িয়ে দিলাম, একেবারে হাল প্যাটার্ণের ইলেকট্রিক চুড়ি, ছ গাছা—শাড়ি কিনে দিয়েছি তিন জোড়া—বাপ মা মরা মেয়ে, ভাইয়ের অবস্থা সুবিধের নয়, ঐ এক-রকম শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বোনকে পাত্রস্থ করা। বুঝতাম, বুঝে কষ্ট হত বলে আমি যখনই পেরেছি এটা-ওটা গড়িয়ে দিয়েছি, কিনে দিয়েছি। আর ও আমায় কি দিল? দুর্নাম, মিছে দুর্নাম। আমি মাতাল আমার অন্য মেয়েমানুষ আছে বাইরে—'

'দেখুন', সুধাংশু যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'এসব আমাকে বলে লাভ নেই। আমি ওদের কেউ নই। আপনাদের মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে আমার তা—বেশ তো, আপনার যা বলবার ওদের

গিয়ে বুঝিয়ে বলুন। লালমোহন, ধুনো দে। সন্ধ্যা হল।' সুধাংশু হাতঘড়ি দেখল। এবং আর একটু অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় ঘাড় ফিরিয়ে ওষুধের আলমারীটা দেখতে লাগল। লালমোহন উঠে ধুনো জ্বালাবার উদ্যোগ করতে লাগল। মাণিক দাস আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে, যেন অনেকটা নিজের মনে বকতে আরম্ভ করল: 'প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম বিয়ের প্রথম রাতেই বোঝা গেছে আমাকে ওর মনে ধরেনি। না হলে কি আর পুরুষ মানুষ বাইরে কি করল না করল তা নিয়ে ঘরের স্ত্রী অমন লম্ফঝম্ফ করে! আসলে আমাকেই ওর ভাল লাগে না। আর শালা আমি এটা দিয়ে ওটা জুগিয়ে হয়রান। তারপর তো একদিন রেগে ঘরের আয়না ভেঙ্গে কাঁচের গ্লাস ভেঙে রেডিওটা নষ্ট করে আমার সিল্কের পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিয়ে রিক্‌শা চেপে ভায়ের কাছে চলে এলো। কিন্তু তারপরও আমি চিঠি দিয়েছি ওর কাছে, ভায়ের কাছে—ভদ্রতার খাতিরে একটা উত্তর পর্যন্ত না—'

যখন মাণিক এসব বলছিল তখন বাইরে দরজায় একটা রিক্‌শা এসে দাঁড়াল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ধুনো দিতে দিতে লালু প্রথম রিক্‌শা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ঢাকনা সরিয়ে দুজন গাড়ি থেকে নেমে লোকটার পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে। তখনও দু ফোটা এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়ছে।

'ওপরের প্রফুল্লবাবু আর তাঁর স্ত্রী এসে গেছে।"

'তাই নাকি!' লালুর মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু অল্প হাসল, আর কিছু বলল না, মাণিক দাস নড়ে-চড়ে পিঠ খাড়া করে বসল।

'এই যে এখানে, ডিস্পেন্সারীতে মালাদির বর বসে আছে।'

মাণিকের তরফ থেকে তেমন একটা সাড়া না পেয়ে লালু তৎক্ষণাৎ আবার দরজার কাছে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

'কে ?' প্রফুল্লর স্ত্রী প্রশ্ন করল এবং থমকে দাঁড়াল।

'মালাদির বর, বরানগরের মাণিকবাবু।' লালু ফিক করে হেসে উঠল। রমলা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। প্রফুল্ল চৌকাঠের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল।

'এই যে, শুন্নন ইদিকে, আপনার ভগ্নীপতি এখানে আছেন।' সুধাংশু হাত তুলে ডাকল। 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

অগত্যা প্রফুল্লকে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতে হল। বেঁটে ছাতা ও ব্যাগ ঝুলিয়ে রমলাও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল।

মাণিক ঘাড় সোজা করে প্রফুল্লকে দেখল। প্রফুল্ল ও রমলা আড়চোখে মাণিককে দেখল।

কিন্তু কোনো পক্ষই সাধারণ শিষ্টাচারটুকু জানাতে গ্রাহ্য করল না। সুধাংশু লক্ষ্য করল।

এক মিনিট সবাই চুপ।

তারপর মাণিক রমলার মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি মালাকে নিতে এসেছি।'

রমলা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি চুপ করে রইল। কথার উত্তর দিল প্রফুল্ল।

'মালা যাবে না।'

মাণিক দাস মাথা হেঁট করল।

যেন সব বলা হয়ে গেছে, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই, রমলার হাত ধরে প্রফুল্ল দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

'যাওয়া না যাওয়া কি ওর ইচ্ছে।' মাণিক ঘাড় তুলে বলল, 'আমি নিতে এসেছি সুতরাং আমার সঙ্গে যাবে, এখনি নিয়ে যেতে চাই।'

প্রফুল্ল মুখ না ফিরিয়ে রুক্ষ গলায় বলল, 'আমার বোনকে তোমার নিয়ে যাবার কোনো রাইট নেই।'

শুনে মাণিক চমকে উঠল, লাফিয়ে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'আইনতঃ ওকে নিয়ে যাবার আমার অধিকার আছে,—আমার বিবাহিত স্ত্রী মালা।' উত্তেজনায় মাণিক দাস কাঁপছিল।

'বিবাহিত স্ত্রী!' প্রফুল্ল মুখ বিকৃত করল। 'মারধর করে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবার সময় কথাটা মনে ছিল না বুঝি।'

'বেশ তো, আইনতঃ যদি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যাবার অধিকার থাকে তবে সেভাবেই চেষ্টা করুন। আদালত থেকে হুকুমনামা নিয়ে আসুন। কিন্তু এখন আমরা যতদূর জানি মালা আর বরানগর ফিরে যাবে না, যেতে পারে না এবং তার অমতে আমরা তাকে আমাদের—' রমলা স্বামীর চোখের দিকে তাকাতে মাথা নেড়ে হাত নেড়ে প্রফুল্ল বলল, 'আমাদের কাস্টডি থেকে ছেড়ে দিতে পারব না।'

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কেন জানি এধারে উপবিষ্ট সুধাংশুর ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে স্বামীর হাত ধরে রমলা চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে নেমে গেল।

'দেখলেন, ছোটলোকদের কাণ্ডটা দেখলেন।' মাণিক ডাক্তারের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সুধাংশু নীরব।

'আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করতে দিলে না, বললে না একবার ওপরে যেতে—' ঠোঁট দুটো কাঁপছে মাণিকের, কাঁদো-কাঁদো চেহারা।

কথা না বলে সুধাংশু হাত বাড়িয়ে টিন থেকে একটা সিগারেট তুলল। হাতের ঘড়ি দেখল। সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে সুধাংশু ঘাড় ফিরিয়ে লালমোহনকে দেখল। লালমোহন হা করে মাণিকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এখন আমি কি করতে পারি, এ অবস্থায় আপনি আমাকে কি করতে অ্যাডভাইস দেন ডাক্তারবাবু, আপনি তো দেখলেন শুনলেন সব কথা?'

'আমি কি বলব, এ ব্যাপারে আমার কি বলবার আছে।' সুধাংশু গম্ভীর। 'আপনাদের পারিবারিক ঝগড়া।'

'না না।' মাণিক আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'প্রফুল্লর স্ত্রী কেমন মিলিটারী মেজাজ দেখিয়ে গেল—এঁ্যা! উনি আমায় আদালত দেখাচ্ছেন হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন। কথা শুনলেন? না কি ছাতা ব্যাগ ঝুলিয়ে চলেন বলে এমন মেজাজ দেখান কথায় কথায়—না কি ছাতা ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটে এমন কুড়ি দু-কুড়ি মেয়েছেলে আমি আমাদের বরানগরের রাস্তায় রোজ দু-বেলা দেখি না!'

সুধাংশু আর একবার হাতঘড়ি দেখল।

'আমাকে এখন উঠতে ইচ্ছে। বাইরে একটা কল আছে।'

কাজেই মাণিক আর চেয়ার টেনে বসতে সাহস পেল না।

সুধাংশু ঘুরে দাঁড়িয়ে আলমারীর চাবি বন্ধ করে। লালমোহন এটা ওটা সরিয়ে গুছিয়ে রেখে জানালা বন্ধ করে।

যেন নিজের মনে কি একটা ভাবল মাণিক। তারপর প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলে মাথা ঝেঁকে বলল, 'আচ্ছা, আমিও দেখে নেব ক'ধানে ক'চাল হয়। এঁ্যা, আইন দেখাচ্ছে, বৌ শ্বশুরের ভিটেয় যাবে না। বটে, আমার নাম মাণিক দাস। বরানগরে আমার ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর তুই প্রফুল্ল

আর তোর ছু-পাতা ইংরেজী পড়া বৌয়ের ভয়ে আমি—আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে'—বলে টলতে টলতে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ননসেন্স, পাগল।' সুধাংশু বিড়বিড় করে উঠল। কিন্তু লালমোহন মুখ কালো করে কি যেন ভাবে।

বারো

প্রফুল্ল চুপ করে ছিল। রমলার মুখে মালা সব শুনল।

প্রফুল্লর ঘরে খাটের ওপর তিনজন গোল হয়ে বসেছে। কথা শেষ করে রমলা ব্লাউজের বোতাম খুলে ছেলের মুখে স্তন গুঁজে দেয়। প্রফুল্ল নতুন বিড়ি ধরায়। বাইরে আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের গায়ে কিসের একটা ছায়ার দিকে তাকিয়ে মালা একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর রমলার দিকে ঘাড় ফেরাল।

'না, আমি ভাবছি, কোন্ লজ্জায় সে এখানে এলো, কোন্ সাহসে বলতে পারল আমি বৌকে নিতে এসেছি।'

'আমার ইচ্ছা করছিল ঘাড় ধরে হারামজাদাকে রাস্তায় নামিয়ে দিই।' প্রফুল্ল মুখ থেকে বিড়ি নামিয়ে নাকের একটা শব্দ করল। 'ওর চেহারা দেখেই তো আমার মাথার ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।'

'এমনিতে চালাক আছে।' রমলা স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃত্থ হাসল। 'ঘাড়ে ধরে বার করে দেবে বলেই তো আর ওপরে ওঠেনি। ডাক্তারখানায় বসে ছিল।'

'আসতো একবার ওপরে।' রমলা গলার স্বর আগের চেয়েও কঠিন করল। 'আমি যা তা বলে ওকে অপমান করতাম, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতাম। আমি কিছুই ভুলিনি, এ-জীবনে ভুলব না।'

'দুশ্চরিত্র—হয়তো মদটদই খেয়ে এসেছিল। এসেছিল কোনো কাজে কলকাতায়। ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে এদিকে। মনে পড়েছে বৌয়ের কথা।' প্রফুল্ল একটুখানি হাসল।

'না তা নয়, তা হলে মুখে গন্ধটন্ধ থাকত,—আমি তো কোনো গন্ধ পাইনি, তুমি কি গন্ধ পেয়েছিলে ?'

সুধাংশু মাথা নাড়ল।

'তবে আর কি।' রমলা বলল, 'এসেছিল মালাকে নিতেই। ভেবেছিল আমরা সব ভুলে-টুলে গেছি, ভেবেছিল আমরা আপত্তি করলেও মালা আপত্তি করবে না। হয়তো ভেবেছিল—'

'আমি আমার বোনকে খুব কষ্টে রেখেছি, খেতে পরতে দিই না। ছেঁড়া কাপড় পরছে, আধপেটা খায়, ঝি হয়ে আছে এই সংসারে এই তো ভাবখানা ?' প্রফুল্ল দাঁতে দাঁত ঘষল। 'কাজেই আমি গিয়ে দাঁড়াবামাত্র আমার গলার আওয়াজ শোনামাত্র মালা ছুটে আসবে কেঁদে-কেটে হাত ধরে বলবে যা হয়েছে হয়েছে, এইবেলা আমায় নিয়ে চল, আমি আর এক মিনিট এখানে থাকব না—এই তো ?'

মালার দিকে আড়চোখে চেয়ে রমলা ক্ষীণ গলায় হাসল। কিন্তু মালা হাসল না।

'শত হোক আমার নিজের মায়ের পেটের বোন কথাটা যেন হারামজাদা চিরকাল মনে রাখে। আমি যদি শাক-ভাত খাই, আমার বোনও দুটি খেতে পারবে।' প্রফুল্ল পোড়া বিড়িতে আগুন দেয়।

'থাক দাদা তোমরা এইবেলা খেয়ে-টেয়ে শেষ কর, রাত হয়েছে।' মালা উঠে দাঁড়াল। 'যে অপদার্থ যে অমানুষ পশু তার সম্পর্কে কিছু বলতে কিছু শুনতেও আমার খারাপ লাগছে। বৌদি, ও ঘুমিয়েছে, রেখে তুমিও বসে পড়, আমি ভাত নিয়ে আসছি।' কুঁজো থেকে দু গ্লাশ জল গড়িয়ে পাশের টি-পয়ের ওপর রেখে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই বেলা রমলা ভাল করে স্বামীর দিকে ঘুরে বসল। প্রফুল্ল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল। মুহূর্তে রমলার চেহারা এমন বদলে যাবে সে ভাবতে পারেনি। 'কি বলছ?' অস্পষ্ট ব্যস্ত গলায় প্রফুল্ল স্ত্রীকে প্রশ্ন করতে রমলার চোখ দুটো আরো কঠিন হয়ে গেল, নাক কুঁচকে উঠল। 'ঈশ্বর তোমার মাথায় একটা শিশুর বুদ্ধি দেয়নি।'

'কেন', ভীত আড়ষ্ট গলায় প্রফুল্ল আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি এখন কি বলতে চাইছ।'

দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে রমলা যা বলার তাই বলল। 'কাল সকালের ডাকে একটা চিঠি ফেলে দাও মাণিকের কাছে। নিতে এসেছে নিয়ে যাক। আমি তো মনে মনে ধরে রেখেছিলাম শেষ পর্যন্ত তুমি রাজী হবে। না হয়ে করবে কি। মালা? তোমার মুখে 'না' শুনেই তো ও এত তেজ দেখাচ্ছে। সুবিধে পেয়েছে। কিন্তু তুমি বাপু যতই বল প্রকৃতপক্ষে কার দোষ তুমি আমি বিচার করতে পারব না। কেউ পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি হয়েছে কি হয় বলা বড় শক্ত, বড় কঠিন। আজ তুমি অমত দিচ্ছ, কাল পরশু কি দুদিন পর এমন হতে পারে এই মালাই তোমাকে দোষারোপ করবে। স্বামী নিতে এসেছিল তুমি দাওনি। এখন ও-ও অবশ্য তোমার সঙ্গে সুর

মেলাচ্ছে, কিন্তু তখন তোমার কথাই কথা হয়ে থাকবে তোমার দোষই দোষ হয়ে থাকবে।' একটু চুপ থেকে রমলা বলল, 'মারধর করে—অনেক স্বামীই স্ত্রীকে মারধর করে। তাই বলে রাগ করে সবাই বাপের বাড়ি ভায়ের বাড়ি চলে আসে না। হ্যাঁ, যখন প্রাণের ভয় থাকে খুন করবে ভয় থাকে তখন—আর সেই সব স্বামী এক দিনই স্ত্রীকে খুন করে, রোজ কিছু মারধর করে না। তার পরও যদি বুঝতাম তুমি বড়লোক, চিরকাল বোনকে ঘরে বসিয়ে খেতে পরতে দিতে পারবে তবে না এই রাগের এই জেদের মানে হয়, কিন্তু কদিন তুমি এভাবে কষ্ট করবে, আমি কষ্ট করব, আমার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে তুমি কি চোখের ওপর দেখছ না, না চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে—না কি তুমি বলতে চাও'—রমলা থেমে গেল। মালা ভাত নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

'এর মধ্যেই ভাত বেড়ে নিয়ে এলে!' যেন একটু অবাক একটু বিরক্ত হতে গিয়েও রমলা তৎক্ষণাৎ তা গোপন করে চমৎকার বাঁকা ঠোঁটে হাসতে পারল। মালা কথা বলল না। ভাতের থালা নামিয়ে রাখল। ঘরে ঢুকেই এক সঙ্গে দাদা বৌদির মুখের ভাব লক্ষ্য করেছে সে, করে এর মধ্যেই একটা কিছু আঁচ করে নিয়েছে। ভাত রেখে তরকারীর বাটি আনতে আবার সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'নাও হাত ধুয়ে বসে যাও।' বাচ্চাকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় রেখে রমলা সোজা হয়ে বসে। প্রফুল্ল ফ্যালফ্যাল করে স্ত্রীকে দেখে। এত সহজে গলার স্বর বদলাতে চেহারা পালটাতে রমলার জুড়ি এই পৃথিবীতে আছে কিনা অবাক হয়ে সে ভাবে। না কি সব মেয়েই এমন প্রফুল্ল তা-ও চিন্তা করে।

বিড়ালটা চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। কোণার দিকে চাউলের ড্রামের পাশে বসে আছে বলে অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছে। কিন্তু মালার চোখও কম জ্বলছে না। 'তুই কি এদিক দিয়ে পাল্লা দিয়ে আমার সঙ্গে পারবি? কত আগুন আছে তোর চোখে শুনি?' মালা নিজের মনে হেসে প্রশ্ন করল তারপর একটা ভাতের ডেলা বিড়ালটার দিকে ছুঁড়ে দিল। শুঁকল কিন্তু ভাত স্পর্শ করল না বিড়াল, মুখ তুলে কটমট করে মালাকে দেখতে লাগল। মাছ নেই। বুঝে মালা আর একটা ডেলা ছুঁড়ে দেয়। এবার আর খেতে আপত্তি নেই। মাছের টুকরো আছে ওই ভাতে। মাছ শুদ্ধ ভাত গিলে বিড়াল জিভ চাটতে থাকে আর গর্‌র্‌ শব্দ করে। 'আচ্ছা এটা দেখতো, মাছ আছে কিনা।' আর একটা ডেলা ছুঁড়ে দেয় মালা। 'পুঁই চিংড়ির চচ্চড়ি দিয়ে ভাত মেখেছি। মাছ কিছু অঢেল নেই তরকারীতে। একটা গরাসে আছে আর একটা গরাসে হয়তো কিছুই পড়েনি। এখন আমি কি করে বুঝব কোন্ ডেলার মধ্যে মাছ লুকিয়ে আছে কোন্‌টায় নেই? আমাদের এই রান্নাঘরের আলোরও তেজ নেই, পঁচিশ পাওয়ারের বাল্ব, তাও ধোঁয়ায় কালিতে কী চেহারা হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস তো—নে, এটা শুঁকে দ্যাখ মাছ পাস কিনা।' আর একটা ডেলা মালা ছুঁড়ে দেয়। দিয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থেকে ভাবে, 'যেন বিড়ালকে ভাতের গরাস দিয়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করছি, কোনটা ও খাবে কোনটা খাবে না। 'হ্যাঁ' কি 'না', মানে আমি এখানে থাকছি কি থাকছি না। এভাবে ভাগ্য পরীক্ষা করা ছাড়া আমার উপায় কি। দাদার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এই সংসার তো আর দাদার ইচ্ছায় চলছে না। সংসারটা গিলে রেখেছে বাঘিনী রমলা। খেতে বসে

তখন কানমন্ত্র দিয়েছে বাঘিনী দাদাকে। মাণিক যখন নিতে চাইছে মালাকে পাঠিয়ে দাও। এই সুযোগ। ভাত দিতে গিয়ে ওঘরে পা দিতেই তো আমি রমলার চেহারা দেখে বুঝে ফেলেছি। না হলে খাওয়ার পর দাদা আবার আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করবে কেন আমি ভাল করে কথাটা চিন্তা করে দেখেছি কিনা—স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, এখানে অন্য কেউ পরামর্শ দেবার নেই—নিজে যা ভাল বোঝ করবে। তা ছাড়া তা ছাড়া—' বিড়ি ধরাবার অছিলায় যে দাদা এরপর কি বলতে হবে ভাবতে শুরু করেছিল মালার বুঝতে কষ্ট হয়নি। তখনকার মত দাদাকে নিশ্চিন্ত করতে মালাকে বলতে হয়েছে, আমি ভেবে দেখব। কিন্তু মালা জানে কাল সকালে তাকে আর ভাবতে দেবার সুযোগই দেওয়া হবে না। সারা রাত মন্ত্র পড়িয়ে পড়িয়ে দাদাকে রমলা এমন করে ফেলবে যে হয়তো সকালে উঠেই দাদা মালাকে ডেকে বলবে, 'আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, যা হবার হয়েছে,—মাণিক এসে একটা ভাল দিনটিন দেখে তোকে নিয়ে যাক।'

তার অর্থ সব ফুরিয়ে গেল সব নিভল।

তাই দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে মালা সরাসরি রান্নাঘরে ফিরে না এসে নিজের ঘরে গেছে। অপেক্ষা করেছে। রমলার ঘরের আলো যতক্ষণে না নেভে। আলো নিভতে ও খেতে এল। খেতে আসেনি ভাবতে এসেছে। ভাবছে আর পাতের ভাত ডেলা পাকিয়ে পাকিয়ে বিড়ালের সামনে ফেলে দিয়ে অদৃষ্ট পরীক্ষা করছে। 'আমি এখানে থাকব কি থাকব না।' একবার না দুবার না। থালায় যত ভাত বেড়ে নিয়েছিল সব ওদিকে ঠেলে ঠেলে দিয়ে পরীক্ষা করা শেষ হয়ে যেতে মালা হাত তুলে চুপ করে বসে রইল। কিছুই বোঝা গেল না। মাছের গন্ধ পেয়ে ষোল সতেরোটা ভাতের

ডেলা বিড়াল গিলল, বাকিগুলো সামনে পড়ে রইল। স্পর্শও করল না।

'না, আমার এখানে থাকা না থাকা নিয়ে এতবার যে পরীক্ষা করে দেখেছি তা দাদার মত না রমলার ইচ্ছা না বরানগরের মাণিক দাসের আবার একদিন ফিরে এসে আমায় নিয়ে যাওয়া না যাওয়ার ইচ্ছার পরীক্ষা নয়। সে সব ইচ্ছার ওপর, কেবল এখানে আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় থাকা না, আমার বেঁচে থাকার,—আমার আমি হয়ে থাকার, আগের সেই মালা হয়ে থাকার সব আশা সব সম্ভাবনা আমি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি।' ভাবতে ভাবতে মালার চোখে জল এসে গেল।

ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছিল।

যেন কি কথা বলতে চাইছে ও, পারছে না।

কিন্তু না বলে উপায় কি।

একটু সময় চুপ থেকে বড় একটা ঢোক গিলে পরে সামনের কালি ঝুল মাখা দেয়ালটাকে সম্বোধন করেই মালা আস্তে আস্তে বলল, 'খুব বেশি লেখাপড়া না শিখলেও আমি এটুকু জানি মেয়েদের শরীর দেবতার মন্দিরের মতন। আমার মা আমাকে একথাই বার বার বলত। তখন আমি কুমারী। বলত, এই মন্দিরে কেবল একটি দেবতাই আসে, আসবে। কোনো মেয়ে যদি অনাছিষ্টি করে, দেবতা আসবার আগেই শরীরকে অপবিত্র করে ফেলে, তবে চিরকালের মতন সেই শরীর অপদেবতার ঠাঁই হয়ে থাকে। সেই মেয়ে নরকের অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না।' বড় ভয় পেত মালা। সারাটা কুমারী জীবন নরকের সেই অন্ধকার আতঙ্কের কথা ভেবে সাবধানে পা ফেলেছে, সতর্ক হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়েছে। মা মরল। মালা কাঁদল। কাঁদল কিন্তু কুমারী জীবনের পবিত্রতা

বাঁচিয়ে রাখার কথাটা একদিন এক মুহূর্তের জন্য ভোলেনি—মা মরে যাওয়াতে কথাটা যেন আরো শক্ত হয়ে তার মনে গেঁথে রইল। তারপর একদিন দাদা বিয়ে দিল। বিয়ের রাত্রে মালার দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসেছিল। 'দুঃখে নয়, মা বেঁচে নেই বলে নয়, কেঁদেছিলাম আনন্দে। দেবতা আসা পর্যন্ত দেহের শুচিতা মন্দিরের পবিত্রতা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা বজায় রাখতে পেরেছি, মার আদেশ মার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি এই তৃপ্তিতে এই সুখে।'

'কিন্তু তারপর? তারপর তো দেখলাম দেবতার রূপ। স্বামীর স্বরূপ। দুশ্চরিত্র মাতাল অত্যাচারী। অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু মনে জোর ছিল সেদিন, সান্ত্বনা ছিল, আমি শুদ্ধ আমি পবিত্র। আমার বেঁচে থাকার সুন্দর থাকার সম্ভাবনাগুলো আমার এই শরীরের মধ্যে আমার মনের এক জায়গায় ফুলের কলির বন্ধ পাপড়ির মত জট বেঁধে আছে। ইচ্ছা করলেই এই ফুল ফোটাতে পারি। কিন্তু ইচ্ছা করি নি। ভাবতাম, কার জন্য ফুল?'

এবার মোটা ধারায় মালার চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। কিন্তু তবু ফুল ফুটল। যেন এই ফোটার ওপর মালার হাত ছিল না। নিজের স্বভাবে একদিন ফুটে গেল। আর সেদিন মালা অবাক হয়ে দেখল, কেবল দেবতা না, কেবল স্বামী না,—পুরুষ, অন্য মানুষও নারীর জীবনে ফুল ফোটাতে পারে। আর সেই ফুলের গন্ধ সেই ফুলের রং বিভা দেবতার পায়ের ফুলের চেয়ে কিছু কম যায় না, বরং বেশি—বুঝি চার দেয়াল ঘেরা মন্দিরের বাইরে এ-ফুল রয়ে গেল বলে তার গায়ে হাওয়া লাগল বেশি আলো লাগল বেশি। তাই এত গন্ধ এত বর্ণ। কি, দেখে মালা নিজেই মাতাল হয়ে উঠল,

উঠছিল। কাল নীরদের চিঠি পড়ে পাপড়িগুলো হঠাৎ কুঁকড়াতে আরম্ভ করেছে। হ্যাঁ, চিঠির ভাষায় সেই ঠাণ্ডা হাওয়া শীত আসছে তার সংকেত। কাপুরুষের আতঙ্ক।

তাই মালার চোখে জল।

'তাই আমি ভাবছি আমাকে নিয়ে এখন আমি কি করি।' জলভরা চোখ দুটো দেয়ালের দিকে মেলে ধরে মালা বলল, 'যদি কেউ বলে মাণিক অনুতপ্ত হয়ে আমাকে ফিরিয়ে নিতে এল, আর সে একদিনও আমার ওপর অত্যাচার করবে না, আমাকে যন্ত্রণা দেবে না, তাহলেও কি আমার ফিরে যাবার উপায় আছে? মায়ের সংস্কার আমার রক্তের মধ্যে থেকে কলকল শব্দ করে বলছে তা হয় না, তা হয় না। একদিন সন্ধ্যাবেলা পাশের বাড়ির বাগান থেকে কিছু ফুল চুরি করে এনেছিলাম। ছুটে আসার সময় একটা ফুল নর্দমার ধারে পড়ে যায়। আর পড়ল তো পড়ল সবচেয়ে সুন্দর বড় গোলাপটা হাত থেকে পড়ে গেল। ওটার ওপর আমার বেশি লোভ তাই এদিক ওদিক তাকিয়ে ফুলটা টুক করে তুলে নিলাম। আমি কি জানতাম জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মা তখন আমাকে দেখছিল। ঘরে ঢুকে হেসে বললাম: মা, দেখ, কত ভাল ভাল ফুল এনেছি তোমার ঠাকুরকে দেবে। গম্ভীর হয়ে মা মাথা নাড়ল: এ ফুল দেওয়া যাবে না। আমি কিছু প্রশ্ন করিনি। আমার বুকের ভিতর ধক করে উঠল। আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে মা বলল: নর্দমার পাশে পড়ে গেল ফুলটা,—ওটা কুড়াতে গেলি কেন, সবগুলো ফুল নষ্ট করে দিলি। একটাও ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না। আজ আমার অবস্থা তাই। মাণিক অত্যাচারী মাতাল হতে পারে, কিন্তু যে-আগুন সাক্ষী রেখে ওকে স্বামী বলে স্বীকার করেছিলাম এখন যদি আমি আমার এই শরীর তাকে দিতে যাই তবে

তো সেই আগুনকেই অপমান করা হল! তা কি করা যায় কখনো ?

'তবে উপায়, এখন আমি কি করি !'

কান্নার ধমকে মালার শরীরটা নড়তে লাগল।

দূরে কোথায় একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে গেল। পাশের ঘরে রমলার বাচ্চাটা একটু কেঁদে উঠে আবার চুপ করে রইল।

'না, তা হয় না।' দাঁতে দাঁত ঘষে এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় নিজেকে শক্ত করে চোখ মুছতে মুছতে মালা উঠে দাঁড়ায়। 'নীরদ, নীরদ। ওকেই বলতে হবে। তোমার কোনো অধিকার নেই নিজেকে গুটিয়ে নেবার, ভালমানুষ সাজবার, ঠাণ্ডা নিশ্বাস ছড়িয়ে আমার পাপড়িগুলোকে নিস্তেজ হতম্লান করে দেবার। আমি তা হতে দেব না।'

তেরো

শোবার ঘরে ঢুকে মালা সাদা শাড়ি ছেড়ে কালো শাড়ি পরল। তার রাত্রির পোশাক। অন্ধকারের সজ্জা। মালার হাত নাড়া কাপড় পরার ভঙ্গীতে এমন একটা কাঠিন্য এমন একটা ব্যস্ততা ফুটে উঠছিল দেখলে মনে হবে যেন যুদ্ধ করবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। চুল ? হ্যাঁ, নতুন করে চুল বাঁধতে হবে বৈ কি। শক্ত করে খোঁপা বাঁধতে হবে। যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি মারামারি করতে গেলেও খোঁপা খুলে না যায়। নিজের ছোট্ট আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ইস! কী চেহারা হয়েছে এই একটা দিনে! মালার বুকের ভিতর তিরতির করে উঠল। শত কষ্টের

মধ্যে দিন কাটালেও একবার তুবার ও মুখে একটু ক্রিম স্নো মাখে, চোখে কাজল বুলায়। আজ সে-সব কিছুই হয় নি। কিন্তু কিছু না করার কোনো অর্থ হয় কি ? 'কারোর জন্য না কারোর জন্য না।' মালা বিড়বিড় করে উঠল। 'আমি আমার নিজের জন্য সাজব, নিজেকে দেখব।' রাজহংসীর মত গলা বাড়িয়ে দিয়ে আয়নার ওপরে বসানো ছোট কাঠের র‍্যাক থেকে টেনে টেনে কাজললতা, পাউডার স্নো-র কৌটো নামাল ও। আলতার শিশিটা নামাল।

'তুমি যা-ই বল, আমি ধরে ফেলেছি তুমি এখন কেটে পড়তে চাইছ সরে যেতে চাইছ,—কি ? তুমি মাথা নাড়লে হবে কি, তোমার চোখ বলছে, তোমার গলার স্বর বলছে তুমি ভয় পেয়েছ। পুরুষ কতক্ষণ পুরুষ থাকে মেয়ে হয়ে আমি যদি তা না বুঝলাম আমার জন্ম বৃথা। এটুকু বুঝতে বেশি লেখাপড়া জানার দরকার হয় না। না, না, তুমি যা-ই বল, আমি অত্যন্ত সরল মেয়ে। সরলভাবে আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়েছি। মেয়েদের সর্বস্ব বলতে কি বোঝায় তা নিশ্চয় জান। আমার আর কে আছে, আমার কি কেউ আছে,—না এরপর থাকা উচিত ? কাজেই চল কোথাও দু'জনে পালিয়ে যাই—বাবু থাকবে, বাবুকে আমি তোমার চেয়েও বেশি ভালবাসব তুমি দেখবে। চাকরি ? পুরুষের কাজের অভাব হয় না। আমিও খাটব। তেমন লেখাপড়া যখন জানি না, গায়ে খেটে যা-হোক দুটো পয়সা রোজগার করে তোমাকে সাহায্য করতে পারব। তুমি প্রথম যেদিন আমাকে চিঠি লিখেছিলে বলেছিলে একমাত্র ভালবাসাই মানুষের জীবনকে সুন্দর সুখী করতে পারে, টাকাপয়সা ঘরবাড়ি কিছু না। আজ সে কথা—'

মালার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

বৌদি জেগেছে কি ? দাদার গলা শোনা যায় ? এত রাত্রে

মালা ঘরে আলো জ্বেলে জেগে বসে আছে টের পেয়ে ওরা ওঘরে আলো জ্বালল কি? বুঝতে পারল।না ও, বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে চট করে এ ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে কতক্ষণ স্থির হয়ে কান খাড়া রেখে পরে ও নিশ্চিন্ত হয়। না, ওদের কেউ জেগে নেই, ওঘরে আলো নেই। নিশ্চিন্ত হলেও সে আর এখানে আলো জ্বালল না। স্নো আলতা কাজললতা যেখানে পড়ে ছিল সেখানেই পড়ে রইল। মনে নেই,—মন ছিল না প্রসাধনে। সাধ অসাধ, ইচ্ছা অনিচ্ছা—প্রসাধন তো তুচ্ছ, যেন বাঁচা মরার স্বপ্ন সাধ রুচি বিতৃষ্ণাগুলো এক একটা তরঙ্গ হয়ে তার মনের তটে এসে আছড়ে পড়ে আবার সেই মুহূর্তে ভেঙে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে, এভাবে সোজাসুজি নীরদকে সে বলতে পারবে কি? 'বরানগরের সেই মাতালটা আজ এসেছিল। আমি বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল বাইরে নিচে ফুটপাথের ওপর। মাতালটা এদিকে তাকাচ্ছে, যেন এ বাড়ির নম্বর দেখছে। আমি তো দেখেই চিনে ফেললাম। চিনতে পেরে রাগে ঘেন্নায় আমার মনের তখন কী অবস্থা! মানুষ ত না, কুকুর—পশুর মতন মনে হচ্ছিল লোকটাকে। স্বভাবের কথা বলছি না, স্বভাব যা আমার জানা আছে, কিন্তু অনেকদিন পর দেখার পরও বন্য জন্তুর কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। নাক চোখ কপাল ঘাড় পিঠের কী শ্রী! আর সেই সঙ্গে তখন মনে পড়ল তোমাকে,—তোমার মুখ তোমার চোখ তোমার চুল তোমার কপাল। সত্যি, তুমি কত সুন্দর। পুরুষ এত সুন্দর আমি কম দেখেছি। বাড়িয়ে বলছি? তা তুমি বলতে পার। কিন্তু এটা তো সত্য আমার চোখে যদি তোমাকে সুন্দর—পৃথিবীর সব পুরুষের চেয়েও সুন্দর লাগে তো

তাতে কারওর কিছু বলবার নেই। কাকে কার চোখে সুন্দর লাগবে কি লাগবে না বাইরে থেকে অন্য লোকে তা বলে দিতে পারে না, পারা উচিত না। তাই বলছিলাম, আমার চোখে তুমি রাজপুত্তুর —দেবতা। হ্যাঁ, মাতাল এসেছিল আমাকে নিতে। তার উত্তরে আমি কি বলতে পারি বল তো?'

নীরদের সঙ্গে মনে মনে কথা বলা বন্ধ করে মালা একটু ভাবে। বলবে কি দাদার ইচ্ছা আছে বৌদির ইচ্ছা আছে কিন্তু তার নিজের একেবারেই ইচ্ছা নেই? যেন কথাটায় তেমন জোর থাকে না। দাদা বৌদিকে এখানে টেনে এনে লাভ নেই। যেন মাণিকের সঙ্গে মালার সোজাসুজি কথা হয়েছে। হ্যাঁ, একটু বাড়িয়ে বলতে হবে বৈকি নীরদকে। দুর্বলকে সবল করতে হলে একটু মিথ্যা করে কিছুটা বেশি করে বলা দরকার। বলবে, 'আমি তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছি, যেমন আমায় সে একদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর একথাও জানিয়ে দিয়েছি, জোর করে এখান থেকে আমায় নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। হয়তো জোর করলে সে আমার শরীর পেতে পারে কিন্তু মন? আমি যে আর একজনকে আমার শরীর মন দুটোই দিয়ে দিয়েছি। তাই নয় কি? তুমি কথাটা ভেবে দেখ নীরদ। আমার শরীর ও আত্মা তোমার কাছে বাঁধা পড়েছে। হ্যাঁ, জানি যদি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই লোকে আমাকে কুলটা বলবে। বলবে মালা চরিত্রহীন নষ্ট মেয়ে। কিন্তু সেটা লোকের কাছে, আমার দাদার কাছে বৌদির কাছে বরানগরের মাণিক দাসের কাছে অথবা পাড়ার আর পাঁচটা লোকের কাছে। কিন্তু তোমার কাছে? তোমার চোখে আমি সুন্দর চিরকাল সুন্দর থাকব। তুমি কি আগে আগে চিঠিতে আমাকে গন্ধরাজ বলে ডাকতে না? বলতে গন্ধরাজ ফুলটি দেখতে যেমন

বড়সড় পরিচ্ছন্ন তেমনি আমিও—অর্থাৎ আমার স্বাস্থ্য ভাল রং ফরসা। বলতে নাকি গন্ধরাজের গন্ধ যেমন মানুষকে পাগল করে আচ্ছন্ন করে তেমনি আমি, আমার শরীরের গন্ধ তোমাকে অস্থির করে, উন্মাদ করে তোলে। কাজেই মাণিককে যখন আজ মুখের ওপর বলতে পারলাম আমি যাব না তার সঙ্গে তখন সব কথা কি বলা হল না, সব সম্পর্ক কি শেষ হল না সেখানে? কাজেই—'

পারবে সে এভাবে নীরদকে বলতে?

মালা ভাবতে লাগল। এভাবে বললে নীরদের মনে সাহস ফিরে আসবে উত্তেজনা আসবে কি? অস্বস্তির কাঁটা মালার বুকের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। যেন এত সব বললেও ভীরু নীরদের সাহস আসবে না, মালার মন বলতে লাগল। বলতে লাগল আর আস্তে আস্তে তার সব শরীর কেমন অবশ নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। কাঁদতে আরম্ভ করল ও। 'কাপুরুষ কাপুরুষ, নিজে দুর্বল হয়ে আমাকে পর্যন্ত দুর্বল করে দিচ্ছে, ওর ভয়ের ছোঁয়াচ আমার মনে লাগতে শুরু করেছে, আমাকে ভয়ে ভাবনায় ভরিয়ে তুলছে, এখন আমি কি করি কি করি!'

শীতের রুক্ষ হাওয়া লেগে গাছের শুকনো পাতা যেমন কাঁপতে থাকে তেমনি এই অন্ধকার ঘরে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বুকে নিয়ে কান্নার ধমকে ও থরথর করে কাঁপতে লাগল। কতক্ষণ এভাবে কাটল। তারপর এক সময় ওপাশের দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে ও যখন রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিল বাইরের সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে কিছুটা শান্তি পেল। সত্যি বাইরে রাত্রির চেহারা তখন অপরূপ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। এলোমেলো হাওয়া আর মেঘে মেঘে আকাশের কী বিশ্রী চেহারা ধরেছিল। এখন সে সব কিছুই নেই। না একটু বাতাস না মেঘের ছিটেফোঁটা চিহ্ন কোথাও।

শান্ত স্তব্ধ নীল আকাশের মাঝখানে রূপোর ডিমের মত এক চাঁদ চুপ করে তাকিয়ে হাসছে। আর সেই হাসি আকাশ চুঁইয়ে নীল সুধার মতন পৃথিবীর ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে। রাস্তার এ পাশে গাছের পাতাগুলো নীল হয়ে গেছে, রাস্তার ওধারের বাড়িগুলো নীল হয়ে আছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল মালার। নীল অপরাজিতা ফোটা মেঘমলিন সন্ধ্যা দেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝরাত্রে কোনোদিন ঘুম ভেঙে গেলে মার সঙ্গে বাইরে ঘরের পৈঠায় পা দিয়ে চমকে উঠত। এক ফোঁটা মেঘ নেই। সারা আকাশ সারা পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভরে আছে। এ সেই আশ্চর্য স্বচ্ছ কোমল নীলাভ রাত্রি। নিশ্বাস বন্ধ করে মালা কিছুক্ষণ দৃশ্যটা দেখল। তারপর তার মনে পড়ল এই রাত আর সেই রাতে আকাশ পাতাল তফাৎ।

সেদিন কি ছিল আজ কি নেই মালা তা ভাবল না। অনেক ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেদিন দূর গাঁয়ের এক খড়ের ঘরে মার বুক ঘেঁষে শুয়ে থাকা ফুলের মতন পবিত্র একটি মেয়ে এখন, আজ এই বর্ষণক্লান্ত জ্যোৎস্না ধোয়া নীল রাত্রি সামনে নিয়ে নিজের অদৃষ্ট ভাবছে ভবিষ্যৎ ভাবছে। তাই কি ? তা নয় তা নয়। ভবিষ্যৎ আর অদৃষ্ট ভেবে ঠিক করার মতন মনের অবস্থা তার নেই। বরং—

যেন রাতটা হঠাৎ বড় বেশি শান্ত সুন্দর হয়েছে বলে মালার মন এতটা শান্ত হয়ে গেল। বুকের ভিতর আর আলোড়ন নেই। স্থির ঠাণ্ডা। যেন একটু বেশি শক্ত! না কি ইস্পাতের মতো ও কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই একটু সময়ের মধ্যে। কি হল। হঠাৎ এত শক্ত শান্ত হবার তো কথা না। মালা নিজেও বুঝতে পারে না। বুঝতে পারল মনের গভীর অন্ধকারের এলোমেলো চঞ্চল ধোঁয়াটে চিন্তা[illegible] আস্তে আস্তে দানা বেঁধে কুটিল ভয়াল রূপ নিয়ে তার

চোখের সামনে ফণা তুলে ধরল। ছোবল মারার আগে সেই ভয়ংকর হিংস্র সতর্ক স্থির মুহূর্ত। যেন এই জন্যই আপাদমস্তক কঠিন হয়ে মালা দাঁড়িয়ে আছে। যেন স্তব্ধ সুন্দর অগাধ নীল রাত্রির সবটা বিষ শুষে শুষে নিজেকে ও নীল বিষাক্ত করছে।

পারবে। পারবে না? খুব পারবে। যে কোনো এক দুপুরে হরির মা একটু এদিক ওদিক সরে গেলে মালা ওঘরে ঢুকে কাজটা সেরে আসতে পারবে। গায়ের জোর? তার দরকার হয় না। মালার বাঁ-হাতের দুটো আঙুলের চাপ যথেষ্ট। ব্যারামে ভুগে ভুগে গলাটা শালিকের গলার মতো নরম লিকলিকে হয়ে আছে। একটুখানি চাপ। এক মিনিট দু মিনিট। তার বেশি সময় লাগবে না। তারপর মালা চলে আসবে নিজের ঘরে। তারপর—

হ্যাঁ, আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নীরদ এখন যে কুটোটার মায়ায় (ছেলের কথা চিন্তা করে নীরদ আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না মালা বোঝে) আগুন নেভাতে চাইছে সরে পড়তে চাইছে বাঁচতে চাইছে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখুক সেই কুটো শেষ হয়ে গেছে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তা না হলে আর প্রতিশোধ নেওয়া হল কি। ভালবাসার খেলায় মালাকে যেমন চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়েছে নীরদকেও দিতে হবে বৈ কি।

পারবে। পারবে না মালা? কথাটা ভেবে গলার কাছটা হঠাৎ তার কেমন ধক্ করে উঠল। কোথায় সে পারে! কতদিন তো মাথায় খুন চেপে যায় তার। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে দু হাতের আঙুলগুলোকে আঁকসীর মতো বাঁকা করে রমলার বাচ্চাটার গলার কাছে নিয়ে গেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কঠিন হাত শিথিল হয়ে গেছে। বাঁকা আঙুল সোজা হয়ে গেছে এক সময়। পারে নি। আর না পেরে রমলার বাচ্চাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করেছে

গালে কপালে চুমো খেয়েছে আর ছলছল চোখে ছোট্ট মুখখানা বারবার দেখেছে।

এখন তাই হল। নীরদের ছেলের বেলায়ও তাই হবে মালার মনে হল। আর মনে হতেই ছুচোখ ছলছল করে উঠল। কিছু হল না। কিছু হবে না। নীল রাত্রির এত বিষ বুকে পুরে নিয়েও ও কিনা পাশের ঘরের রোগা ছেলের শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখখানা মনে করে কাঁদতে লাগল।

'কি হবে! তবে আমি কি করব! এই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে আমাকে পথ বাতলে দেবার পরামর্শ দেবার কে আছে! ঈশ্বর ঈশ্বর।'

বিছানায় এলিয়ে পড়ে আবার ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল ও। তারপর একসময় দূরে পেটা ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ শুনে আস্তে আস্তে উঠে চোখ মুছল।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

'না।'

'কাঁদছিলে মনে হয়? আজ আবার কাঁদছ!'

'হঁ্যা।'

'কেন।'

'তুমি—আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন না।'

নীরদকে একটা বড় ঢোক গিলতে শোনা গেল।

'কি হয়েছে, এরকম করছ কেন, মালা!'

মালা নিরুত্তর। ছু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদে।

'এই শোন, ছি,—কী ছেলেমানুষী করছ?'

নীরদ এবার ওর মাথায় হাত রাখল। মালা মাথা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল না। সাহস পেয়ে নীরদ ওকে বুকের কাছে টেনে নিল।

হাত সরিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি বড়ো অস্থির—বড়ো অশান্ত।'

'কি করে শান্ত থাকব!'

নীরদ হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না। চুপ করে উত্তর খোঁজে।

'এ অবস্থায় কেউ শান্ত থাকতে পারে, স্থির থাকতে পারে! পুরুষ পারে। মেয়েরা পারে না। আমি পারছি না। তুমি—'

'আমি তো চিঠিতে সব বলেছি, এখনি—'

'আমি সাহস পাই না, আমার আর দেরি করতে ভয় হয়।'

'কেন?'

'তুমি যদি এখন সাহস না পাও ভবিষ্যতে সাহস পাবে তার ঠিক কি। সেই ভেবে আমার ভয় করছে।'

'কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি। আরে আমি তো আছি-ই—কথা বোঝ না কেন।'

'না না না, আর একদিন না, আজই চল, কাল চল কোথাও দুজনে সরে যাই।' নীরদের গলায় হাত রাখল মালা।

'আশ্চর্য!' অস্ফুটে শব্দ করে নীরদ থেমে গেল।

'কি, বলো?' নীরদের গলায় মৃদু ঝাঁকুনি দিল মালা।

'চিঠিতে এত করে সব ভেঙে বুঝিয়ে বললাম—'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা।' মালা হাত নামিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। 'তবে আগে এসব কথা আমাকে বোঝাও নি কেন, প্রথম দিন প্রথম রাত্রে!'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' নীরদ উত্তেজিত হতে গিয়ে আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে রইল। 'এখনি তোমায় নিয়ে কোথাও সরে পড়ার বিপদগুলো তোমার মাথায় আসছে না?'

'না না না।' ঝড়ের মত ফুঁসিয়ে উঠল মালা। 'আমার মাথায় আর কিছু আসছে না। আমি এখন জানি শুধু তোমাকে। আমি চাইছি তুমি যত শীগ্‌গির হয় আমায় নিয়ে ঘর বাঁধো।' একটু থেমে মালা বলল, 'এ ছাড়া আর কোনো পথ আছে আমার জানা নেই।'

'তবে কি—' কেমন যেন আঁৎকে উঠতে গিয়েও নীরদ হঠাৎ থেমে থেকে গম্ভীরভাবে মালার চোখ ছুটো দেখে আরও নিবিড় করে ওকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে কপালে চুমু খায় আর অল্প অল্প হাসে। 'বুঝেছি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর না, আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না বলে ভয় লাগছে তোমার।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না, কথা হচ্ছে এভাবে থাকতে আমার ভাল লাগছে না।' মালা আবার হাত ছুটো নীরদের কাঁধের ওপর তুলে দিল। 'আমার কেন জানি কেবল মনে হচ্ছে এভাবে চুরি করে রাত্রে রাত্রে তোমার কাছে আসার কোনো মানে হয় না। এটা নোংরামী। এর নাম পাপ। আমরা পাপ করছি। আর এই পাপের ফলে আমরা বিপদে পড়ব। ছুজনেই পড়ব। আমি তুমি। তার চেয়ে চলো দূরে কোথাও সরে গিয়ে একত্র থাকি। যেখানে পাপ নেই। সেটা সুন্দর সেটা ধর্ম। ছুজনের নতুন জীবন দেখে নতুন ঘর দেখে ঈশ্বর সুখী হবে। আর আমরা বিপদে পড়ব না, কোনোদিন পড়ব না—তুমি দেখো।'

'বুঝি, আমি সব বুঝতে পারছি, তুমি যখন সেভাবে থাকতে চাইছ তোমার মন যখন চাইছে তখন নিশ্চয় একদিন সেভাবে থাকবে। সত্যিকারের চাওয়ার, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষ সব পায়। তার ইচ্ছা ভগবান পূরণ করে। কিন্তু ঠিক এক ছুদিনের ভেতর তো তা সম্ভব না—আর শোন একটা কথা, যে-কথা প্রথমেই

তোমায় বলব বলে ভেবে রেখেছিলাম,—নীচে ডাক্তারখানায় শুনলাম লালু মহারাজের কাছে তোমার স্বামী নাকি এসেছিল, তোমাকে বরানগর নিয়ে যেতে চাইছিল।'

'হ্যাঁ।' নীরদের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে মালা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'তোমার দাদা বৌদি নাকি মাণিকবাবুকে অপমান করেছে ?'

'তা আমি শুনিনি, তবে তাদের কারুর ইচ্ছা নেই আমি বরানগর ফিরে যাই।' মালা গলার স্বর কঠিন করল। 'সেখানে আর আমার যাওয়া হয় না।'

'কেন ?' একটু থমকে থেকে নীরদ আস্তে আস্তে বলল, 'আসলে তো সে তোমার স্বামী। নিজে থেকে যখন ভদ্রলোক—'

'তা হলেও আমার ফিরে যাওয়া হয় না, এখন আর হয় না।' 'এখন' কথাটার ওপর মালা বড় বেশি জোর দিল।

'কেন ?' মৃদু হাসল নীরদ। 'যা-ই করুক, আবার যখন নিজে থেকে নিতে চাইছে—'

'আশ্চর্য !' অস্ফুট একটা শব্দ করে মালা থেমে গেল।

'না আমি বলছিলাম কি,—প্রথমটায় শুনে অবশ্য আমারও ইচ্ছে ছিল না তুমি সেখানে ফিরে যাও, কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা ভুল হবে। আমি বলছি কি তুমি যাও এখন, দিনকতক গিয়ে থাক বরানগর,—ঝগড়াঝাটি রাগারাগি তা হবেই, লোক যখন সুবিধের নয়,—আবার চলে আসবে দাদার বাসায়। আমি তো রইলামই।'

মালার পা দুটো কাঁপছিল ঠোঁট কাঁপছিল। কি বলতে গিয়ে বলতে পারে না। নীরদের কথা শুনে যায়।

'এটাই সবচেয়ে নিরাপদ, বুঝলে না? কি, যদি দরকার হয় সুবিধা বুঝি এখানকার ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি না হয় তোমাদের বরানগরে গিয়ে থাকব। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোনো ঘরটার নিশ্চয়ই

ভাড়া পাওয়া যাবে। তলে তলে তুমিও খোঁজ করবে। আমি—আমার কোনো অসুবিধা হবে না বরানগর থেকে এসে অফিস করার। আরো কত শত মাইল দূরে থেকেও লোকে কলকাতায় এসে রোজ অফিস কাছারী করে।—না, বলছিলাম কি এর চেয়ে আর ভাল কিছু ব্যবস্থা হতে পারে না। হ্যাঁ, লোকেও কিছু টের পেল না। ওদিকে তোমারও স্বামী সংসার সব বজায় রইল, অথচ আমাদের—আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝেছ।'

'উঃ!' যেন বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব করল মালা। '—তুমি এত নিষ্ঠুর তুমি এত পাষণ্ড এত নীচ!' বলতে চাইল ও কিন্তু পারল না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে রইল।

'কি, বলো?' নীরদ ওর বুকের ওপর হাত রাখল।

মালা হাত সরাল না। যেন পাথরের মতো স্থির অনড় ও। পা দুটো কাঁপছে না আর। বুকের স্পন্দন থেমে আছে।

'কি!' বিরক্ত হল নীরদ। 'তোমরা মেয়েরা ভয়ংকর সেন্টি-মেণ্টাল মানে এত নরম মন! আমি বুঝতে পারছি লোকটার কাছে তোমার আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না, হওয়া উচিত না,—আমাদের দুজনের ভালবাসা প্রেমের গভীরতাই অবশ্য এর কারণ। কিন্তু তা হলেও করা কি। অবস্থা বুঝে কাজ করতে হবে, সময় বুঝে চলতে হবে। তুমি তো আর ওকে ভালবাসতে যাচ্ছ না, যেতে হচ্ছে সামাজিকতা রাখতে সমাজের মুখ রাখতে—'

বাধা দিল মালা। আর বাষ্প নেই আবেগ নেই—কুণ্ঠা জড়তা সব মুছে ফেলে প্রখর পরিচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আমি কি আবার স্বামীর ঘর করব বলে তোমার কাছে ধরা দিয়েছিলাম। না, এর পর কোনো মেয়ে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। আমি পারব না, জেনে

শুনে অত বড় পাপ কাজ অধর্মের কাজ আমার দ্বারা হবে না। ছিঃ! এসব তুমি আজ কি বলছ!'

'কী মুশকিল!' চাপা গর্জন শোনা গেল নীরদের গলায়। 'যত সব বাজে সেন্টিমেণ্ট! সংস্কার। পাপ অপাপ ধর্ম অধর্ম—এসব হল মনের কাছে। মনে করলেই পাপ, মনে না করলেই পুণ্যি।' একবার থামল নীরদ তারপর যেন উত্তেজিত হবে না সংযম হারাবে না মনে পড়তে অল্প শব্দ করে হাসল। 'কেন, তোমার শরীরটা কি পচে গেছে না ক্ষয়ে গেছে কোনোখানে যে স্বামীর কাছে যেতে মনের সায় পাচ্ছ না—অধর্ম! অশিক্ষিত মেয়েরা এ ধরনের কথা বলে।

'তুমি চুপ কর, তুমি চুপ কর।' ক্রুদ্ধ গর্জন করতে গিয়ে মালা ছু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। আর দাঁড়াল না।

'এই—' সাপের মতো হিসহিস করে উঠল নীরদ। 'এই শোন—'

মালা শুনল না। ওধারের দেয়ালের অন্ধকারে চট করে মিশে গেল। ছিটকিনি তোলার 'কটাস' শব্দটা নীরদ শুনল ঠিক।

হল না, কিছুই হল না। ব্যর্থ ব্যর্থ! অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ঘরের আলো জ্বেলে দেয় মালা। তাতে কি! অমাবস্যার অন্ধকার তার ছু চোখে এসে বাসা বেঁধেছে। আলোতেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সত্যি তো! কানেও তো কিছু শুনতে পাচ্ছে না ও। দেয়ালে টিকটিকিটা শব্দ করে, পাশের ঘরে বৌদির বাচ্চা কেঁদে ওঠে, রমলার, দাদার ঘুমের লম্বা লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দগুলো এঘরে ভেসে আসে। এখন যে কিছুই তার কানে আসছে না। যেন হঠাৎ

এক পাতালপুরীতে নেমে এল ও। কি হবে কি হবে! মালার ভয় করতে লাগল। জিভটা বিস্বাদ ঠেকছে। কেবল বিস্বাদ না, পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে, জড় হয়ে পড়ে আছে মুখের ভিতর, ইচ্ছা করলেও মালা এখন সেটা নেড়ে একটা কথা বলতে পারবে না। কাঁদতে চেষ্টা করল কিন্তু চোখের জল শুকিয়ে গেছে। 'কি হল কি হল আমার!' মালা নিজেকে প্রশ্ন করল। শরীরের সব কটা ইন্দ্রিয় তার বন্ধ হয়ে আছে মরে গেছে। কেবল শরীরটা আছে। স্থির অনড় ঠাণ্ডা শক্ত একটা বড় মাংসখণ্ড। দোকানে ঝুলিয়ে রাখা মাংসগুলো মনে পড়ল মালার। আজ ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে আছে কাল সকাল থেকে পচতে আরম্ভ করবে। তারপর পোকা পড়বে পোকা কিলবিল করবে। এর দাম নেই। উঃ এত বড় ঠাট্টা! আমিও রইলাম তোমার স্বামীও রইল! তবে আরো একজন থাকতে দোষ কি, আরো একজন, আরো আরো—বিকেলে বাড়ির সামনের পার্কে যত পুরুষ জড়ো হয় সব। দেয়ালটা শক্ত করে ধরে না রাখলে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ত ও। পড়ল না। দাঁড়িয়ে থেকে কেবল মার মুখ মনে করতে চেষ্টা করল, আর কিছু না, আর কেউ না।

চৌদ্দ

'ঈশ্বরের ইচ্ছা, সবই ভগবানের হাত।' চায়ের পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল প্রফুল্ল। 'না হলে ও এদিকে যেমন একটু বেশি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠছিল, পর্যন্ত তোমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিয়েছিল ঠিক তখনই কেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার কথা মনে হবে মাণিকের, নিজে এসে উপস্থিত হবে।'

'যাক গে, ও রাজী আছে তো, যাবে তোমায় বললে?' রমলা তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীর মুখ দেখল।

প্রফুল্ল হেসে ঘাড় নাড়ল।

'যাবে না অর্থ কি! আমি বললে নিশ্চয় তাকে যেতে হবে। স্বামীর কাছে না গিয়ে উপায় কি।' একটু থেমে থেকে প্রফুল্ল বলল, 'অবশ্য অনেক বোঝাতে হয়েছে। হ্যাঁ, আবার যদি যন্ত্রণা-টন্ত্রণা দেয় শুনি আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি মালাকে এখানে চলে আসতে। আমার দরজা সব সময় তোর জন্যে খোলা আছে, আমি দু মুঠো খেলে তুইও খাবি। হ্যাঁ যদ্দিন পর্যন্ত বুঝব যে আমার বোন বিনা কারণে বিনা দোষে লাঞ্ছনাগঞ্জনা পাচ্ছে—ভাল বলিনি?'

রমলা চুপ করে কি ভাবল। কোলের বাচ্চাটাকে দোলাতে লাগল।

প্রফুল্ল বলল, 'তোমার কাছে কি পোস্টকার্ড আছে এক আধটা। আজই বরানগর চিঠিটা চলে যাক।'

কপালে ভুরু তুলল রমলা।

'সে কি, পোস্টকার্ডে চিঠি লিখবে মালা ওর বরের কাছে? নাকি ওর শ্বশুরকে লিখছে।'

প্রফুল্ল মাথা নাড়ল।

'এতক্ষণ তো বোঝালাম,—কিন্তু রাজী করাতে পারলাম না। লজ্জা করে, বলল, আমি পারব না। বলল, তুমি লিখে দাও। তা ছাড়া তুমিই তো আমার এখানকার অভিভাবক। তোমার চিঠিতেই কাজ হবে বেশি। সুতরাং—'

'বুঝলাম।' মুখটা অপ্রসন্ন রয়ে গেল রমলার। 'ও লিখলেই ভাল হত। ও স্ত্রী। তুমি কবে এসে মালাকে নিয়ে যেতে লিখছ?'

'এই একটা ভাল দিনটিন দেখে?'

'খবরদার ! আর দিন দেখাদেখির কাজ নেই। যেন চিঠি পাওয়া মাত্তর মালাকে এসে নিয়ে যায়। কাল বা পরশু। আজ এই সকালের ডাকে চিঠি ফেললে কাল সকালেই মাণিক পেয়ে যাচ্ছে। আছে, পোস্টকার্ড যেন একটা আছে আমার কাছে।' বাচ্চাকে ধপাস করে বিছানায় নামিয়ে রেখে রমলা উঠে টেবিলের কাছে ছুটে গিয়ে হাত-বাক্স হাতড়াতে লাগল।

যেন এতক্ষণ পর একটা বিড়ি ধরাবার সুযোগ পেল প্রফুল্ল। বিড়ি ধরিয়ে প্রসন্ন গলায় বলছিল, 'দেখলাম সংসারে ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য জিনিসগুলো এখনো আছে। জানতাম আমার বোন যখন আজ অবধি কোনো অধর্মের কাজ করে নি, খাঁটি আছে, তখন ও কষ্টে থাকবে না—নিশ্চয় আবার একদিন স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করবে—তাই হল তাই হবে—ঠিক কিনা।'

'দাঁড়াও বাপু।' ওদিক থেকে রমলা রুষ্ট গলায় বলল, 'এত তত্ত্বকথা শোনাতে পার তুমি ! কোথায় গেল কার্ডটা, এখানেই তো কাল বিকেলে রাখলাম ছাই—আর কোথায় যেতে পারে !'

পোস্টকার্ড খুঁজে বার না করা পর্যন্ত রমলা কোনো কথা কানে নেবে না চিন্তা করে প্রফুল্ল চুপ করে বিড়ি টানতে লাগল।

নীল জ্যোৎস্না ঝরা রাত্রির পর দিন তো উজ্জ্বল হবেই। বড় বেশি উজ্জ্বল বড় বেশি মাজাঘষা চেহারা আকাশের রৌদ্রের। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টি ঝাপসা ঠেকে, চোখের পাতা আপনা থেকে বুজে আসে। তা হলেও মালার ভাল লাগছিল এই প্রখরতা এই ঝাঁজ। দাদাকে কোনোরকমে কথাটা দিয়ে এসে ও রান্না-বান্না ধোয়া-মোছা সেরেছে। দাদা বৌদি চান করেছে ভাত খেয়েছে

তারপর কাজে বেরিয়ে গেছে। মালা বাচ্চাটাকে চান করিয়েছে খাইয়েছে। ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়েছিল এখন উঠে আবার কাঁদছে। কাঁদুক। মালা চান করে নি খায় নি। ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে ঘুরে জানালায় এসে গরাদ ধরে কেবল বাইরেটা দেখছে। এত ভাল লাগছিল তার। এত ভাল লাগছে রৌদ্রের জ্বালা আকাশের আগুন। ভিতর পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়। মালার মনে হল এই আগুনে যারা পুড়ে যেতে পারে তারা শুদ্ধ হয় তারা পবিত্র হয়।

একটা ভোমরা কানের কাছে গুনগুন করছে অনেকক্ষণ ধরে। ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে। গানটা মালার বারবার মনে পড়ছে। কবে কার গলায় শুনেছিল মনে করতে পারছে না। কিন্তু তখন গান শুনে এত ভাল লাগেনি তার, এখন ভোমরার ওড়াউড়ি দেখে আর গুণগুণ শুনে যত ভাল লাগছে।

না কি আজ তার সব ভাল লাগছে! বাইরে আকাশ, রোদ, ঘরের ছায়া, ছায়ার অন্ধকারে চোখ জুড়ানো কালো ভ্রমরের নাচানাচি।

একটা লম্বা নিশ্বাস ওর বুকের ভিতর থেকে উঠে এল। তাই হয় তাই হয়।

মানুষের জীবনে, সব মানুষের জীবনে এমন একটা দিন আসে যেদিন আকাশের নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে এই পৃথিবীর কুটোটা ধুলোর কণাটাও ভাল লাগে। মনে হয় এদের আমি কোনোদিন ভাল করে দেখিনি। আজ ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যদি কেউ তাড়া দেয়, দেখা শেষ হল কিনা প্রশ্ন করে, তবে তার ওপর রাগ হয়, তাকে মারতে ইচ্ছা করে কামড়াতে ইচ্ছা করে।

আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখব।

এই ইচ্ছা বুকে নিয়ে মালা জানালা থেকে সরে এসে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রমলার ছেলেকে দেখতে লাগল। রমলার মুখ। রমলার মুখকে মালা কতদিন ঘৃণা করেছে। আজ আর ঘৃণা না। আজ কাউকে ঘৃণা না, কটু কথা না। ভালবাসা, শুধুই ভালবাসা। রমলার ছেলেকে বুকে তুলে ওকে ভালবাসার চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিতে দিতে মালা ঘর ছেড়ে তাদের সরু প্যাসেজে এসে দাঁড়ালো। যেন ওদিকের পৃথিবী দেখা শেষ করে মালা এই জগতটা দেখতে এসেছে। চোখাচোখি হল হরির মার সঙ্গে। নীরদের থালা গ্লাশ ধুয়ে বুড়ি কলতলা থেকে আসছে। মালাকে দেখে হাসল।

'শুনেছি, বৌদির মুখে এই মাত্তর শুনলাম। জামাই নিতে চাইছে। কাল চলে যাচ্ছ। কাল বা পরশু।'

'হ্যাঁ, হরির মা চলে যাচ্ছি। আর কত, অনেকদিন তো থাকলাম, অনেকদিন কাটালাম তোমাদের সঙ্গে।'

যেন এতক্ষণ পর এই প্রথম 'চলে যাচ্ছি' কথাটা জানাবার মতো একটা মানুষ পেয়ে মালার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। বৃষ্টির ফোঁটার মত দুটো বড় ফোঁটা টুপ করে নিচে ঝরে পড়ল।

'ছিঃ ভাই কাঁদে না।' হাতের থালা গ্লাস নামিয়ে রেখে বুড়ী কথা আরম্ভ করেছিল। এখন সেই হাত দিয়ে মালার চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগল। 'চিরকাল কি আর কেউ বাপ ভায়ের কাছে থাকতে পারে। মেয়েছেলে পারে না। মেয়েছেলের সব ইষ্টির ইষ্টি সব দেবতার দেবতা হল বর, সোয়ামী।' একটু থেমে বুড়ী হঠাৎ নিজের চোখ মুছতে আরম্ভ করল। 'কত ভাল মেয়ে, কত সুন্দর মেয়ে। তাই তো আমি ভাবতাম, এই মেয়ে কেনে দুঃখু পাবে, এই মেয়ের কপালে তো আমি তেমন কোনো মন্দ চিহ্ন দেখি নে—তাই তো বলে পুণ্যির জয় সতীর জয়—সোয়ামী যদি এমন মেয়েকে ঘরে

ফিরিয়ে না নিতে আসবে তবে আর কাকে নেবে যাও ভাই, সুখে থাক।'

'মালা-দি মা-লা-দি।' ক্ষীণ নিস্তেজ কণ্ঠস্বর পাশের থেকে ভেসে এল।

মালা বুড়ীর চোখের ভিতর তাকায়। হরির মা এবার হাসল। 'আমার খোকন সোনা ডাকছে তোমাকে। ওকেও খপরটা দিয়ে এনু কিনা।'

'যাচ্ছি।' মালা বাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে নীরদের ঘরের দিকে চলল। হরির মা পিছনে হাঁটে। হাঁটে আর কতদিন একসঙ্গে দুজনে গল্প করে করে দুপুর কাটিয়েছে সে সব কথা তোলে।

'তুমি চলে যাচ্ছ মালাদি।'

'হ্যাঁ, ভাই। আর কত তোমাদের সঙ্গে থাকব। এবার চলে যেতে হচ্ছে।' বাবুর মাথার উপর হাত রাখল মালা। মুখখানা দেখতে লাগল। প্রতিমার মুখ। কিন্তু প্রতিমাকে সে কোনোদিন ঘৃণা করে নি, হিংসা করে নি। আজ তো আর সে সবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আজ—

'মালাদি, তুমি আমাকে চিঠি লিখবে?'

'লিখব, নিশ্চয় লিখব।' মালা মধুর হাসল। 'তুমিও আমাকে চিঠি লিখবে। পারবে না—' হঠাৎ যেন ব্যথা পেয়ে মালা থেমে গেল।

'তাতে কি।' বাবু হাসল, 'আমি বাবাকে বলে বলে দেব। বাবা লিখবে। হ্যাঁ, নামটুকু আমি শুয়ে থেকেও সই করতে পারব—হবে না?'

'হবে।' কোমল চোখে মালা নীরদের ছেলেকে দেখে শেষ করে উঠব উঠব করছিল।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল বাবুর।

'তুমি কাল পরশু চলে যাবে। আমরাও এ মাসে চলে যাব মালাদি। এ মাসের শেষের দিকে।'

'কোথায়?'

'আজকে বাবা বলছিল তাঁর ছুটির অর্ডার হয়ে গেছে। তিন মাস। আমায় নিয়ে বাবা চেঞ্জে যাবে—পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে।'

'ভাল।' বুকের ভিতর ধক করে উঠতে চেয়েছিল। একটা বড় ঢোক গিলে মালা তা চাপা দিল।

'ফিরে এসে আমি তোমাকে চিঠি দিয়ে জানাব কি কি দেখে এলাম—কেমন?'

'তাই জানিও। চলি ভাই।' নুয়ে বাবুর কপালে চুমু খেল মালা। পরের ছেলেকে চুমো খেতে দেখে ঘরের ছেলে—রমলার ছেলে ঈর্ষায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল। 'ছিঃ কাঁদে না কাঁদে না, এই তো তোমায় আমি চুমো খাচ্ছি।' বলতে বলতে মালা নীরদের ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। 'চিরকালের মতো চিরজন্মের মতো তোমার ঘর তোমার ছেলেকে দেখা শেষ করে এলাম। আর কোনোদিন দেখতে যাব না দেখা হবে না—আর—'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপতে গিয়ে ঠোঁট কেটে গেল। রক্ত এল যেন। জিভের ডগা দিয়ে রক্তটা চেটে নিয়ে মালা গিলে ফেলল। 'ভালই হল। একটু রক্তের দরকার ছিল। রক্ত না গিলতে পারলে চোখে এখন বর্ষার ধারা নামত। তা আর নামতে দিলাম না।' বলতে বলতে,—ভাবতে ভাবতে মালা তাদের ঘোরানো লোহার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায়। 'এদিকটা দেখা হয় নি। দেখে নিচে নামব। নিচেটাও দেখে যাওয়া দরকার।' রমলার বাচ্চার কান্না তখনও থামছিল না। 'কাঁদে না, ছিঃ কাঁদে না। চলো নিচে চলো, আমি তোমায় লজেন্স কিনে দেব।'

সিঁড়ির ধাপগুলো ভাঙছে আর মালার সুন্দর পা দুটো কাঁপছে। 'চলি, চললাম রে ভাই, আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না।' যেন অনেককালের পরিচিত বন্ধু সিঁড়িটাকে সম্বোধন করতে গিয়ে মালা থমকে দাঁড়ায়। ভাবে। 'কতটা আফিং একজন মানুষ খেলে তবে সে মরে—কিন্তু লালুকে কি দোকানী আফিং দিতে চাইবে—ছোট ছেলেদের কাছে ওরা নাকি এসব জিনিস বিক্রি করে না—' তারপর মালা আবার ভাবল: 'আফিং-এর দোকান এ পাড়ায় আছে কি। ঠিক জানা নেই। লালমোহন খুঁজে বার করতে পারবে কি—রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করবে—কিন্তু কেউ যদি হঠাৎ সন্দেহ করে বসে।' মালার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। একটা হাত সিঁড়ির রেলিং-এর ওপর। আর এক হাত দিয়ে রমলার বাচ্চাকে ধরে রেখে নিচের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো চিন্তা করছে ও। হাওয়ায় শাড়ির আঁচলটা নিশানের মতো পতপত করে উড়ছে। শুকনো বাসী খোঁপাটা অর্ধেক ভেঙে ঘাড়ের ওপর থুবড়ে পড়ে আছে। 'তা হলেও একবার চেষ্টা করতে হবে তো—যদি তা একান্তই যোগাড় না হয়—না পাওয়া যায়—' আবার নিচেটা দেখল মালা। খোয়া আর পাথরের টুকরো আর কিছু আস্ত ইট। 'এতটা উঁচু থেকে লাফিয়ে নিচে ওসবের ওপর পড়লে—প্রাণটা সঙ্গে সঙ্গে বেরোবে—না কি হাত পা ভেঙে বিশ্রী একটা অবস্থা হয়ে থাকবে? তবে আর একটু ওপর থেকে আর দু'ধাপ উঁচু থেকে?' ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মালার বুক কাঁপতে লাগল। 'তা এখন তো কাঁপবেই—এখন ভাবতে গেলে ভয় করা স্বাভাবিক। ঝোঁকের মাথায় যেমন হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে লাফ দিতে হয় দেব দরকার হলে।' আঁচল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছল মালা।

রমলার বাচ্চা আবার কাঁদছে।

'চলো, চলো লালুর কাছে।' সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করল মালা। 'লালু তোমায় বিস্কুট কিনে এনে দেবে। আমি বললে ও সব এনে দেয়—দেবে।'

'এই লালু শোন।'

'দেখে যাও মালাদি, ইদিকে এসো দেখবে।' ওষুধের আলমারীর পিছনে দাঁড়িয়ে লালমোহন উত্তেজনায় কাঁপছে।

'আগে তুই শোন না।' মালা ডাক্তারের শূন্য চেয়ারটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডাকে। 'আমাদের খোকনের জন্য একটা ভাল বিস্কুট এনে দে, মোড়ের দোকানে পাবি, আর আমার জন্য এক আনার ডালমুট আর—তুই আমার কাছে আয় না।'

'তুমি এসো, এসে একবারটি শুধু দেখে যাও।'

'কি দেখব?' মালা বিরক্ত হয়ে এক পা এক পা করে আলমারীর ওধারে যায়। 'কি করছিস তুই এখানে?'

'এই দেখো—, এই যে—'

এক ভয়ংকর খেলায় মেতে আছে লালমোহন, এক ভীষণ খেলার পরীক্ষা তার ছোট্ট চোখ দুটোতে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে জ্বলছে।

মালা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

লালমোহন ফিসফিসিয়ে উঠল।

'তুমি দেখ, এক দুই তিন গোণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা মরে কিনা।'

কথা বলছে না মালা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ইঁদুরের খাঁচাটাকে দেখছে। একটা ছোট কাগজের পুরিয়া থেকে দেশলাইয়ের কাঠির মাথায় করে খানিকটা গুঁড়ো তুলে লালু জিলিপির ভাঙা টুকরোটার ওপর রাখে তারপর কাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে টুকরোটাকে

খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। ইঁদুরটা ভয়ে সরে গিয়ে খাঁচার আর এক কোণায় আশ্রয় নেয়। খাঁচার ধার থেকে লালমোহন হাতটা সরিয়ে আনতে ইঁদুরটা ছুটে এসে জিলিপির টুকরোটায় কামড় বসিয়ে দিল। এক দুই তিন। লালমোহন ফিসফিস করে উঠল। মাত্র একবার। একটুখানি ছুটতে পারল বেচারা। আর পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। শরীরটা সামান্য কাঁপল। লেজের ডগাটা দুবার নড়ল। তারপর সব শেষ। যেন দেখতে দেখতে শক্ত হয়ে গেল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা চোখ বোজা একটা খোলা। মুখটা একটু খোলা। তাতেই দেখতে পাওয়া গেল সাদা ধারালো মসৃণ দু পাটি দাঁত দিয়ে বেচারা জিভটা কামড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল, যাতে জিভটা মুখ থেকে আলগা হয়ে থাকে। লালার সঙ্গে গলে গিয়ে বিষটা পেটে ঢুকতে না পারে। কিন্তু পারল কি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে। যেটুকু পেটে গেছে তাতেই কাজ হয়েছে। যেন মরবার আগে ও টের পেয়ে গেল কেন তার এই মৃত্যু।

এক ফোঁটা রক্ত ঠোঁটের পাশে জমেছে মালা লক্ষ্য করল।

'কি করলি! মরে গেল?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ।' লালু শব্দ না করে হাসে।

মালা নাকে কাপড় গুঁজল।

'পচা পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। যেন তোর এখানটায় আরো ইঁদুর মরে পচে আছে।'

লালু এবার অল্প শব্দ করে হাসল।

'মরা ইঁদুর দেখলেই তোমরা ইঁদুর পচল ভাব।' অন্ধকার কোণা থেকে আর একটা খাঁচা তুলে আনল লালু। 'এই তো এখানে আরো দুটো রয়েছে। কিন্তু পচে নি তো। কতক্ষণ? আধ ঘণ্টাও হয় নি মরেছে। মারলাম আমি নিজের হাতে।'

'ওই গুঁড়ো খেয়েই মরল।' মালা তেমনি হাঁ করে তাকায়।

লালু মাথা নাড়ল।

'ওধারের কমল ময়রার দোকানে আজ তিন তিনটে ইঁদুর খাঁচায় আটকা পড়েছিল। আমি চেয়ে নিয়ে এলাম। কালকে এনেছিলাম একটা। ওদের ঘরে লাখ লাখ ইঁদুর হয়েছে।'

একটা বড় ঢোক গিলল মালা।

লালু বলল, 'তা মাগনা কি আর দেয় কেউ কিছু আজকাল। এমনি ওরা মেরে ফেলত। গরম লোহার শলা দিয়ে গুঁতিয়ে কি জলে ডুবিয়ে। আমি কমল ময়রার ছেলেকে তিন আনা নগদ দিয়ে তিনটে কিনে এনেছি। বললাম আমার একটা জিনিস পরীক্ষা করার আছে। কালকে যেটা ধরা পড়েছিল সেটা এমনি দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু। আজ চাইতেই পয়সা—তা কেমন দেখলে ?'

মালা বেশ একটুক্ষণ লালুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন তাকিয়ে থেকে কি ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,— 'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন ?'

'বিকেলের আগে না। চারটে বাজবে। সাড়ে এগারোটায় ভাত খেতে চলে যায়। ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে চারটে হয়।'

'তোর খাওয়া হয়ে গেছে ?'

'এই তো একটু আগে হোটেল থেকে খেয়ে এসে কাজে লেগেছি।' লালু কাগজের পুরিয়াটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নেয়। মালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তারপর এক সময় ঘাড় তুলে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর মুখটা লালুর মুখের কাছে সরিয়ে নেয়।

'গুঁড়োটা কোথা থেকে যোগাড় করলি ?'

মালার প্রশ্ন শুনে লালমোহনকে এই প্রথম চমকে উঠতে দেখা

গেল। কিন্তু সামলে নিল। চালাক ছেলে। মিষ্টি হেসে বলল, 'কেন বল তো মালাদি ?'

'না এমনি, এমনি জিজ্ঞেস করছি, সাংঘাতিক বিষ কিনা ?'

'সাংঘাতিক মানে!' উত্তেজনায় লালুর গলার স্বরটা কেমন খসখসে শোনায়। 'আলপিনের আগায় করে একটু জিভে ঠেকালেই —ব্যস হয়ে গেল।'

যেন উত্তেজনায় মালার বুকটা কাঁপছে। হঠাৎ বুকের ভিতর ঢুবঢুব শব্দটা তার কানে এল। মুখের ভাব গোপন করতে তাকে অন্যদিকে তাকাতে হল পর্যন্ত। তারপর সামলে নিল। মিষ্টি হেসে বলল, 'আমায় একটুখানি দে কাগজে করে—'

'কেন তোমার কি—?' লালু থেমে থেকে মালার চোখ দেখে।

'ভীষণ ইঁদুর, আমাদের ওপরটায় যা ইঁদুর হয়েছে কী বলব !'

এক সেকেণ্ড কি ভাবল লালু। তারপর আর ভাবল না। যেন কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। সাঁ করে ছুটে গিয়ে সামনের দিকের দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে এসে লালু ছুটে গেল আলমারীর কাছে। ট্যাঁক থেকে একটা ছোট চাবি বার করে আলমারীর ডালা খুলে একটা ছোট্ট নীল শিশি বার করে আনল। এক টুকরো কাগজে খানিকটা গুঁড়ো ঢেলে নিয়ে শিশিটা আবার জায়গামত রেখে দিল। তারপর আলমারীর ডালা বন্ধ করে কাগজের পুরিয়াটা মালার প্রসারিত ডান হাতের ওপর তুলে দিয়ে বলল, 'নাও, খুব সাবধান! হাত দিয়ে ছোঁবে না।'

'না ছোঁব না।' হাত কাঁপছিল মালার। আর একটা ঢোক গিলল। পুরিয়াটা ব্লাউজের মধ্যে ঢোকাল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ওই চাবি কোথায় পেলি !'

'তালাওয়ালাকে ডেকে করিয়ে নিয়েছি। না হলে কি আর ডাক্তার আমার জন্যে আলমারী খুলে রেখে যায়। অথচ আমি এসব পরীক্ষা-টরীক্ষা করতে এক ফোঁটা ওষুধ পাইনে। তাই তো—'

'দেখিস খুব সাবধান।' মালা এবার সরে এসে দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিল। রোদের ঝলক ঘরে ঢুকতে তার ভাল লাগল।

'আমি সাবধান আছি।' বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল লালমোহন। 'আমি তো জানি এখানকার কোন ওষুধের কি কাজ, কোন বিষের কি কেরামতি। হি—হি, রাতদিন এসব নিয়েই আছি।'

'সাবধান খুব সাবধান!' বলতে বলতে মালা দরজার বাইরে চলে এল।

'তুমি কিন্তু হাত দিয়ে মোটেই ছোঁবে না।' পিছন থেকে লালু বলল! 'কই, বিস্কুট-টিস্কুট আনতে দিলে না, মালাদি?'

'দাঁড়া, আমি ওপরে এটা রেখে আসি। এসে তোকে বিস্কুটের পয়সা ডালমুটের পয়সা দেব।'

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল মালার, লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘোরানো সিঁড়ির কাছে চলে এল ও। কোলে রমলার বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওপরে এসে কেমন ক্লান্তি বোধ করছিল ও। যেন অনেক পথ হেঁটে এসেছে। বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মালা স্বাভাবিক নিশ্বাস ফেলতে পারল। তা হলেও তার যেন আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। মেঝের ওপর দু পা ছড়িয়ে দিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে বসল ও। ব্লাউজের ভিতর থেকে পুরিয়াটা বার করল। পুরিয়া খুলে সাদা গুঁড়োটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পুরিয়াটা মুড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রেখে মেঝের ওপর

শূন্য দৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগল। একটুখানি নিচে থেকে ছুটে এসে এতটা ক্লান্তি বোধ করছে কেন মালা ভেবে পেল না। তার মনে পড়ল ছোটবেলাকার এক বিকেলের কথা। কত বয়স? বছর এগারো? তারও কম। পুরো দুটো হপ্তা জ্বরে ভুগে উঠে সেদিন বুঝি পথ্য করেছিল ও। বিকেল পড়তে ঘরের পৈঠায় পা ঝুলিয়ে বসে উঠোনের পাশে পেয়ারা গাছটার দিকে তাকিয়ে কচি সবুজ পেয়ারা পাতাগুলো দেখছিল। সবে ফাল্গুন মাস শুরু হয়েছে সেদিন আর এক সঙ্গে এত কোমল নরম কচি-পাতায় গাছটা ছেয়ে গেল দেখে তার মনটা যে কী ভাল লাগছিল! পৈঠা ছেড়ে আস্তে আস্তে ও পেয়ারা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। মা এসে কখন পিছনে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। গলার স্বরে টের পেল। 'পায়ে জোর পাচ্ছিস হাঁটতে পারছিস একটু?' 'একটু একটু পারছি মা'—মালা বিষণ্ণ হেসে উত্তর করেছিল। এবং একটুখানি হেঁটে যাওয়ার দরুন যে সে হাঁপাচ্ছিল ক্লান্তি বোধ করছিল মার কথা শুনে তবে বুঝতে পারল। টিয়ে রঙের নতুন পেয়ারা পাতাগুলো তাকে টেনে নিয়ে গিছল উঠোনের ওধারে। আজ? আজ সেই ক্লান্তি তার শরীরে মনে। কিন্তু সেদিন তো মার হাতে ধরে মার বুকের ওপর মাথার ভর রেখে শরীরের ভর রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে আবার পৈঠায় এসে উঠেছিল। আজ?

জল গড়াতে লাগল মালার চোখ দিয়ে।

আজ কটা দিন ধরে কেবল ছোটবেলার কথাগুলো তার মনে হচ্ছে, ছবিগুলো চোখের ওপর ভাসছে। কেন? তাই হয়। চিরকালের জন্য যে-মানুষ চোখ বুজতে যাচ্ছে তার চোখের সামনে এসব ছবি এসে ধরা দেয় বৈকি। চিরদিনের মতো মালার চোখের আলো নিভতে চলল।

কটা বাজে ? যেন হঠাৎ সময়ের কথা মনে পড়ে ও চমকে উঠল। জানালার বাইরে পাশের বাড়ির টালির ছাদে সেই লম্বা ছায়াটা পড়েছে না ? ছায়া দেখতে মালা উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তিনটে বাজে। একটু পরে কলে জল আসবে। বিকেলের কাজগুলো তো সেরে রাখতে হবে। না তার আগে আর একটা কাজ আছে। বাপীকে দুধ খাওয়াতে হবে।

না, মালা চাইছে, চিরদিনের মতো এই সংসার ছেড়ে যাবার আগে সে সব কটা কাজ ভাল করে করে যাবে, যাতে রমলা এসে দেখে খুশি হয় দাদা সুখী হয়। মালা মরে যাওয়ার পরও কথাটা যাতে তাদের মুখে লেগে থাকে। 'না, এমন মেয়ে আর হয় না। কী সুন্দর ঘরের কাজকর্ম করত ! একটু আলস্য ছিল না, একটু—'

মালা ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল। দুটো ঘর বেশ করে ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেলে মেঝে দুটো মুছে ফেলল। তারপর হাত ধুয়ে কাগজ জ্বেলে বাচ্চাটার দুধ গরম করতে বসল। 'বাপি।' মালার কোলে বাপী। 'আমি মরে গেলে আমার চেহারা তোর মনে থাকবে, বড় হয়ে আমার মুখ মনে করতে পারবি ?'

শিশু কালো চোখ মেলে মালার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। হাত নাড়ে পা নাড়ে। যেন কথাটা শুনে ও বেজায় খুশি হয়েছে।

তারপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে মালা এক সময় কথাটা চিন্তা করল। আজ সে সাজবে। বেশ ভাল করে সাজবে। আর তো এ-জীবনে সাজা হবে না। সেজে আয়নায় নিজেকে দেখবে। সব কিছু তো তার দেখা শেষ হল। এখন শুধু নিজেকে দেখা বাকী। শেষ দেখা। শেষ দেখা। শেষ দেখা। নিজেকে চিরজন্মের মতো দেখে শেষ করার উত্তেজনায় তার হৃদপিণ্ড দুরদুর করতে লাগল।

বিষের পুরিয়াটা ব্লাউজের নিচে বুকের ঘামে ভিজছে টের পেল ও। ভিজুক। 'ঘাম এই বিষের কিছু করতে পারে না। এই বিষ চায় শুধু রক্ত—বাসী পচা ঠাণ্ডা রক্ত না, আমার শরীরের গরম টাটকা রক্ত।' মালা বিড়বিড় করে উঠল।

দুধ খাওয়ানো শেষ করে বাকী কাজগুলো এক দমে শেষ করে ফেলল ও। কলতলায় আর একবার বুড়ীর সঙ্গে দেখা। 'আমার দিদিকে আজ খুব খুশিখুশি লাগছে।' বুড়ী বলছিল। 'স্বামীর কাছে যেতে পারলে সব মেয়ে খুশি—না হরির মা?' হেসে উত্তর করে মালা গুনগুনিয়ে কি যেন একটা গান গাইছিল।

গা ধুয়ে ঘরে ফিরে মালা সকলের আগে পায়ে আলতা পরল। তারপর চুল নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়াল ও। তারপর সেই ঘন কালো রাশি রাশি চুল দিয়ে এক আশ্চর্য খোঁপা করে ফেলল। আয়নায় দেখে মালা অবাক। এমন সুন্দর খোঁপা তো সে অনেকদিন করতে পারেনি। বুকটা টনটন করে উঠল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে মালা দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। কিন্তু তা হলে হবে কি। রুদ্ধ কান্নার ধমকে বুক ফুলে ফুলে ওঠে। শরীর থরথর করে কাঁপে। 'এই নাক এই চিবুক এই ভুরু এই চোখ নিয়ে আমি ফুলের মতো সুন্দর এক মেয়ে। কিন্তু তা হলে হবে কি। এই ফুল দেবতার পূজায় লাগল না খেলার সাথীর খেলায় লাগল না। তুমি তো এক সুন্দর সাথী হয়ে এসেছিলে আমায় নিয়ে খেলবে বলে। এখন ভয় পাচ্ছ কেন। খেলার মধ্যে আবার ভয় কি। এসো এসো। যদি না এসো তো দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কি?'

কুটিল কঠিন হয়ে উঠল মালার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি মেলে ধরল ও দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায়। তারপর এক সময় রোদ মুছে গেল আলো নিভে গেল। পাউডারের ডিবি স্নোর কৌটো আলতার শিশি তুলে রাখল মালা। ধোয়া শাড়ি ব্লাউজ নামিয়েছিল পরবে বলে সেগুলো আবার বাক্সে ঢোকাল। খোঁপা ভেঙে ফেলল। তারপর সাবান আর জল নিয়ে বসল পায়ের আলতা তুলতে।

'ওকি! এ তুমি করছ কি ঠাকুরঝি।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমলা হাসতে লাগল। 'বেশ তো সেজেছিলে। এতে লজ্জার কি। কাল পরশু মাণিক যখন নিতে আসবে আলতা তো পরতেই হবে।'

মুখ তুলে শূন্য অপলক চোখে মালা রমলাকে দেখতে লাগল। যেন বৌদির কোন কথা তার কানে যাচ্ছে না। কালা হয়ে গেছে। কোন কথা বলতে পারছে না। বোবা হয়ে গেছে।

'তোমার কি হয়েছে মালা?'

কথার উত্তর না দিয়ে মালা সাবান ঘষে পায়ের সবটুকু রং তুলে ফেলল।

পনরো

নীরদ ভয় পেল। বাথরুমের দেয়াল ধরতে গিয়ে সে হাত গুটিয়ে আনল। দেয়াল ধরতে পারল না। কেননা দেয়ালের ধার ঘেঁষে ও দাঁড়িয়ে আছে। নীরদের মনে হল এ মালা নয় অন্য কিছু, অন্য কোন জীব। চোখ দুটো জ্বলছে। মালার চোখ তো কোনোদিন অন্ধকারে এভাবে জ্বলজ্বল করে না। বিড়ালের চোখ জ্বলে, কুকুরের চোখ অন্ধকারে জ্বলে কি? নীরদ মনে করতে পারল না। রাত্রে ইঁদুর

ধরবার সময় বিড়াল যেমন হিংস্র চোখে তাকায়, থাবা তুলে ধরে, মালাকে দেখে নীরদের এখন তাই মনে হল। কালো শাড়িতে মোড়া মালার শরীরকে আজ আর সুন্দর লাগছে না নীরদের চোখে। বরং তার মনে হল দেয়ালে ভর দিয়ে একটা দুষ্টু সরীসৃপ চুপ করে তাকিয়ে আছে এদিকে, নীরদের দিকে। এখনি লাফ দিয়ে নীরদের ঘাড়ের ওপর পড়বে। নীরদ ঘামছিল। একটা ঢোক গিলল। গভীর রাত্রে মালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন অস্বস্তিবোধ করবে জানলে সে আজ আসত কি?

'কথা বলছ না কেন?' খসখসে গলার স্বর মালার। নীরদের মনে হল গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েছে।

'আমার গায়ে হাত রাখছ না কেন?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত। প্রশ্নটাই একটা মোটা ঠাট্টা হয়ে নীরদকে আঘাত করল বুঝতে পেরে নীরদ তেমনি স্থির কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বস্তুত নীরদের আর সংশয় রইল না মালা আজ চরম কিছু বলতে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, চরম কিছু করতে তৈরী হয়ে আছে।

'কি?'

'কিছু না।' এত আস্তে নীরদ উত্তর করল যে গলায় স্বর না ফুটে তার ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে উঠল। অন্ধকারে মালা নীরদের ঠোঁট নড়া দেখল না।

'কথা বলছ না কেন, মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভয় করছ?' মালা হাসল। 'হঠাৎ এত ভয়?'

'তাই।' এবার নীরদের স্বর ফুটল।

'কেন?' মালা নীরদের হাত ধরল।

নীরদ হাত ছাড়াল না।

'তুমি অবুঝ। অবুঝকে নিয়ে মানুষের চিরকাল ভয় তুমি নিশ্চয় জান।'

'কিন্তু আমাকে অবুঝ কে করেছে?' মালা নীরদের হাত ছেড়ে দিয়ে কালো শাড়িতে মোড়া সরীসৃপের মতো শরীরটা সোজা করে ধরল। 'আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করে দিয়ে এখন যদি তুমি—' মালা থামল।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।' নীরদ নীরস তিক্ত গলায় বলল, 'বার বার এক কথা বলছ কেন। চিঠিতে কি আমি তোমায় সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলিনি?'

'কিছুই বোঝাতে পারনি। এমন সব বিদঘুটে কথা লিখেছ যে পড়ে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যেটুকু ছিল গুলিয়ে গেছে। মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। আমার মনে হয়—'

'হ্যাঁ, বলো, থামলে কেন,' নীরদ গলার স্বর একটুও নরম করল না, 'কি মনে হয় তোমার—?'

'আমি পাগল হয়ে গেছি।' অস্বচ্ছ ভাঙা বিকৃত গলায় মালা কেঁদে ফেলল। কান্নার সুরটাই কেমন অসুস্থ অস্বাভাবিক মনে হল নীরদের। এবার নীরদ ওর হাত ধরতে হাত বাড়াল, মালা হাত সরিয়ে নিল।

'আমাকে ছোঁবে না।'

'বেশ, ছোঁব না!' যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করল নীরদ। 'আমি জানতে চাইছি তুমি বরানগর ফিরে যাবে কি যাবে না।'

'সেখানে আমার কেউ নেই।'

'তুমি তোমার দাদার কথা রাখছ না—তার অবাধ্য হচ্ছ?'

'দাদাকে বাধ্য করিয়েছি যাতে আর আমাকে সেখানে না পাঠায়।'

'কি রকম?' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল নীরদ। 'কি বলেছ দাদাকে শুনি?'

'বলেছি তোমার সঙ্গে আমার প্রণয় গাঢ় হয়ে গেছে—আর সেখানে আমার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।'

'মিথ্যা কথা।' নীরদ হাসল। 'আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি একথা তুমি তোমার দাদাকে কখনই বলতে পার না।'

'পারি না, না?' কান্না থেমে গেছে মালার। অস্বচ্ছ ভাঙা বিকৃত গলায় এবার হাসল ও। 'আমাদের গোপন প্রেমের কথা কখনই আমার জিভ থেকে খসে বাইরে ছিট্‌কে পড়বে না, কেমন?'

'হ্যাঁ।' বলল বটে নীরদ, কিন্তু তার বুকের ভিতর কেমন ধক্‌ করে উঠল। মালার কান্না শুনে তার অস্বস্তি লাগছিল, এখন ভাঙা বিকৃত কণ্ঠের হাসি শুনে তার মাথা ঘুরছিল। কড়া ওষুধের ঝাঁজের মতো তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে হাসিটা তার নাকে মুখে চোখে এসে লাগল। তা হলেও নীরদকে ভয় পেলে চলবে না। গলার স্বর সংযত রেখে সে বলল, 'এইবেলা সত্যি তুমি পাগলামি আরম্ভ করেছ, এরকম করলে আমি—আমি চললাম।' প্রায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে নীরদ, মালা খপ্‌ করে তার হাত চেপে ধরে।

'পালাচ্ছ কেন?'

'তুমি এসব বাজে বকছ কেন।'

'কি বাজে? অ, দাদাকে—না না সত্যি বলিনি।' মালার হাতটা এবার নীরদের গলায় উঠল। 'এমনি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম। দাদা জেনে গেলে তুমি খুব ভয় পেয়ে যাবে, না?'

বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে নীরদ কপালের ঘাম মুছল।

'এরকম করলে আর কখনও আমি তোমার কাছে আসব না।'

'না না, আর কখনও এসব বলব না।' মালা শক্ত হাতে নীরদের

গলা চেপে ধরল। গরম নিশ্বাসের হলকা নীরদের কপালে লাগে। 'আস্তে, লাগছে যে।' নীরদ মালার কব্জি ধরে নাড়া দেয়। কিন্তু মালা দু'হাত দিয়ে নীরদের গলা আরও জোরে চেপে ধরতে নীরদ শরীরে মোচড় দিয়ে গলা ছাড়িয়ে আনে। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে সে। মালা শব্দ করে হেসে উঠল। সত্যি ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নীরদ ভাবল আর ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তার মেরুদাঁড়া বেয়ে আচমকা একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। নিশ্চয় এখন এখানে একটা গণ্ডগোল তুলতে চাইছে মালা। শব্দ করে কাঁদা, শব্দ করে হাসা। যাতে পাশের ঘরে ওর দাদা বৌদি টের পায়। গোলমাল শুনে ওরা বেরিয়ে আসুক, এসে দেখুক মালার পাশে কে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। মালা আর কেন বরানগর ফিরে যেতে চাইছে না। এই ?

চাপা গলায় নীরদ হিস্‌হিস্‌ করে উঠল : 'আমি চললাম, আমি শুতে যাচ্ছি।'

'না, তোমার এখন যাওয়া হবে না, কথা আছে।' চাপা গলায় মালা গর্জন করে উঠল। নীরদ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত এভাবে ছুটে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ারও বিপদ আছে। নীরদ চিন্তা করল। যদি সত্যি মেয়েটার মাথার গোলমাল হয়ে থাকে! দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যে দরজায় কিল লাথি মেরে চিৎকার জুড়ে না দেবে তার বিশ্বাস কি। সে আরো কেলেঙ্কারী!

নীরদ গলার স্বরটাকে আশ্চর্য রকম কোমল ও মসৃণ করে ফেলল।

'কি বলো, আমি তো তোমার কথা শুনতেই দাঁড়িয়ে আছি।' রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে দূরের পেটা ঘড়িতে একটা বাজল।

'আমার মুখের কাছে ঠোঁটের কাছে কান পেতে ধরো।' মালা বলল।

'এই তো এনেছি কান, বলো।'

যা বলবার মালা বলল।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো নীরদ মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি কি করে বুঝতে পারলে?' নীরদের গলার স্বর রূঢ়। কিন্তু যদি আলো থাকত দেখা যেত তার মুখের রং মোমের মতো সাদা হয়ে গেছে! 'কি করে তুমি—' নীরদ থেমে গেল। তার পা দুটো কাঁপছিল।

'আজ আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম।' মালার গলার স্বর ঠাণ্ডা নরম। যদি আলো থাকত দেখা যেত তার ঠোঁটে ক্রূর কুটিল হাসি উঁকি দিয়েছে। 'হাসপাতাল থেকে বলে দিয়েছে—'

'মিথ্যা কথা, আমি বিশ্বাস করি না,' কোনোমতে নীরদ বলে শেষ করল। 'এ হতে পারে না।'

'হ-তে পা-রে-না হবে না, কেমন তাই না,' যেন কাঁদত মালা, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে হাসল! 'যদি হয় কি করবে?'

নীরদ এবার মালার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল।

'কেন এসব বাজে বকছ, আমি জানি তুমি হাসপাতালে যাওনি, যাওয়ার মতন কিছু হয়নি—শোন, যদি তুমি আর কোনোদিন এ ধরনের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাও তবে—'

'হ্যাঁ, বলো, থামলে কেন—তবে? তবে?' শেষের কথাটা শোনা গেল না মালার। কেবল গলার একটা খসখস শব্দ শোনা গেল। যেন শব্দটা অন্ধকার দেয়াল থেকে দেয়ালে আঁচড় কেটে কেটে বেড়াতে লাগল। একটা চামচিকে থেকে থেকে পাখা ঝাপটাচ্ছে অন্ধকার কোন কোণায়।

'তবে তুমি কি করবে?' মালা হঠাৎ পরিষ্কার গলায় প্রশ্ন করল। 'কি করবে শুনি?'

'এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাব এই দেশ ছেড়ে—আর কী করার আছে আমার।' নীরদ আবার হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তার গেঞ্জিটা ভিজে গেছে।

'তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম, তাই আমি তোমার কাছে জানতে এসেছি।' এবার আর কুটিল হাসি না, সহজ গলায় মালা কথা বলল। 'হয়তো আমার ভয় সন্দেহ মিথ্যা হবে। হয়তো কিছুই হবে না! কিন্তু কোন সত্য নিয়ে তুমি বেঁচে আছ আমি তাই দেখছিলাম, কাপুরুষ!'

'মালা?'

'ঠিক আছে।' যেন বড় বেশি নিঃসংশয় হতে পেরে মালা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। 'চলি—চললাম।'

'এই শোন!'

'আমার হাত ধরবে না।'

'এই তুমি কি করছ, এই এই!' উন্মত্ত ঝড়ের মতো নীরদ মালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'দেখি তোমার হাতে কি, এটা কিসের পুরিয়া?'

মাত্র এক সেকেণ্ড। এক সেকেণ্ড কম সময়ের মধ্যে পুরিয়া খুলে মালা গুঁড়োটা মুখে ফেলতে পারত। পারল না। যেন নীরদ বুঝতে পেরেছিল যেন সে তৈরি হয়ে ছিল এমন একটা সাংঘাতিক কিছু করবে মালা। ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে পুরিয়াটা সে তুলে নিল।

'পাগল মূর্খ বন্য!'

'লম্পট পশু চোর।'

'আমি তোমায় এখনি পুলিশে ধরিয়ে দেব এই গুঁড়োর খবর দিয়ে।'

'তার আগে মালা গোল ঘোরানো সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে পড়বে।'

'এসব করে কি হবে?' দাঁতে দাঁত ঘষে নীরদ প্রশ্ন করল।

'প্রতিশোধ। জান না মেয়েমানুষের গায়ের রক্তে আগুন ধরিয়ে সরে পড়তে চাইলে কাপুরুষ পুরুষের কি দশা হয়?'

'মূর্খ বন্য!'

'অপদার্থ লম্পট!'

মালা অন্ধকারে সরে গেল।

নীরদ ঘরে চলে এল। টেবিলের ছোট্ট আলোটা জ্বালল। পুরিয়া খুলে গুঁড়োটা পরীক্ষা করল। একবার নাকের কাছে নিল। তারপর চুপ করে ভাবতে লাগল। ভাবতে গিয়ে ভয়ংকর বিব্রত বোধ করল সে। মালার কথা যদি মিথ্যা হয় তবে কি সে আরো সাংঘাতিক না? অর্থাৎ আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে ও কি করে নীরদকে বিপদে ফেলবে। পুরুষকে বিপদে ফেলতে মেয়েরা কত কিছুর আশ্রয় নেয়।

নতুন করে নীরদের কপাল ঘামতে থাকে।

'আর যদি সন্দেহ সত্য হয়—'

'আমার মৃত্যুর জন্য নীরদ দায়ী কথাটা লিখে রেখে যেতে ওকে বাধা দিচ্ছে কে?'

তারপর? যেভাবেই মালা নিজেকে ধ্বংস করুক, কাল ডেড বডি মর্গে চালান যাবে। তারপর? নীরদ কাঁপছিল, কেঁদে ফেলল। দুঃখে নয় অনুশোচনায়, ভয়ে আতঙ্কে। কান খাড়া করে ধরল সে।

যদি মালা সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে তার শব্দ হবে। হবে কি ? হয়তো ইতিমধ্যে হয়েছে শব্দ নীরদ শুনতে পায়নি। কিন্তু তারপর ? মালার নিচে পড়ার শব্দ সে শুনল কি শুনল না সেটা বড় কথা না—তারপর ?

উত্তর খুঁজতে বা বলা যায় জীবনে এই প্রথম উপদেশ চাইতে নীরদ ঘাড় তুলে প্রতিমার দিকে তাকায়।

'উত্তর তোমার হাতে রয়েছে মূর্খ।' প্রতিমার দুচোখ ঘৃণার জ্বালায় ছোট হয়ে আছে। 'মালার কাছ থেকে তো উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছো, অত ভাবছ কি ?'

তাই তো অত ভাবছে কি সে। হাতের বিষের পুরিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নীরদ। এবার প্রপাতের মতো তার দু চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়ায়। যেন বিষ হাতে নিয়ে তার কাঁদতে ভাল লাগছিল। দস্যু রত্নাকরের কথা নীরদের মনে পড়ে: অনুতাপের অশ্রুজলে পাপ ধুয়ে গেল। 'আমার যাবে কি ? যদি সারারাত কাল সারাদিন বসে কাঁদি আমি পাপমুক্ত হব ?'

'তা কি করে হবে। মালার শব মর্গের রিপোর্ট মালার চিঠি এগুলোকে তুমি কি দিয়ে চাপা দেবে। এটা সত্য যুগ না। অপরাধ করলাম অনুতাপ করলাম আর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটল। এখন আইন আছে পুলিশ আছে। সুতরাং—'

সেদিনের সেই নীরদ আজ আবার আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে এই নীরদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। নীরদ দু হাতে চোখ ঢাকল।

'আমি অনুতপ্ত, সত্যি আমি অনুতপ্ত, আমার দুষ্কৃতির জন্য আমি—' অস্থির হয়ে নীরদ পায়চারি করতে লাগল। 'কি করতে পারি রে খোকন।' অসহায় শিশুর মতো ছেলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নীরদ এক সময় প্রশ্ন করে। 'তুই বল খোকা, তুই আমায়

বলে দে আমি কি করব?' গাঢ় নিশ্বাস ফেলে বাবু ঘুমোচ্ছে। মশারীর ভিতর রোগা পাঁশুটে মুখটা দেখা যায়।

'আশ্চর্য। তুমি এখন দুধের বাচ্চার কাছে পরামর্শ চাইছ?'

চমকে উঠল নীরদ। প্রতিমা কথা বলছে। প্রতিমা তিরস্কার করছে। কিন্তু দেখে নীরদ অবাক হল প্রতিমার চোখে ঘৃণার জ্বালা অনেকটা কমেছে, যেন নেই আর, সেখানে মমতা এসেছে সহানুভূতি জেগেছে।

'কি করতে পারি, কি করতে বলছ তুমি?' কাতর কণ্ঠে নীরদ প্রশ্ন করল।

'আমি তো তোমায় বলছিলাম, কথা শেষ করতে দিলে কই— তার আগেই তুমি তোমার বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতে লেগে গেছ।'

'না না প্রতিমা, আমার বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে, আর যখনই আমার এই দশা হয়েছে তুমি কি আমায় উপদেশ দাও নি—বল বল কি করব?'

প্রতিমা হাসল। ওর বুদ্ধি উজ্জ্বল দুই চোখ হাসির ছটায় কত অপরূপ হয়ে ওঠে নীরদ আজ নতুন করে দেখল। ফটোটা একটু উঁচুতে টাঙানো, না হলে নীরদ ওর চোখের পাতায় চুমো খেত।

'শোন।'

'কি?'

খোকার বিছানার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে প্রতিমা আবার নীরদের চোখে চোখ রাখল।

'তোমার কোনো দোষ হবে না। আমি বলছি। না, এমনিও ও বাঁচবে না। এভাবে নিরর্থক ওর বোঝা তোমাকে বইতে হচ্ছে

দেখে আমার কত কষ্ট হয় তুমি জান? তার চেয়ে বরং তোমার হাতের ওই জিনিস দিয়ে—'

'প্রতিমা!' ভীত আড়ষ্ট নীরদ।

'আমি বলছি তোমার কোনো দোষ হবে না।'

'তারপর?' কাতর চোখে নীরদ স্ত্রীকে দেখল।

'চলে যাও মালাকে নিয়ে দূর সমুদ্রের ধারে কি নির্জন পাহাড়ের অরণ্যে। শুধু তুমি আর ও সেখানে। আমি নেই খোকা নেই।'

'প্রতিমা!'

'হ্যাঁ, সেখানেই সুখ অনন্ত সৌন্দর্য এবং সেটাই চিরকালের সত্য—সত্যকে অস্বীকার করা পাপ। আমি তোমার সহধর্মিণী হয়ে তোমাকে কি পাপ করতে দিতে পারি!'

'তুমি আমায় অনুমতি দিচ্ছ প্রতিমা?' প্রশ্ন করল নীরদ, তারপর আস্তে আস্তে টেবিলের কাছে সরে গেল। কাচের গ্লাসটা টেনে আনল। গ্লাসে বিষ ছেড়ে দিয়ে নীরদ রাত্রির গাঢ়তা অনুমান করতে লাগল। আর তার হৃদপিণ্ডের শব্দ।

'মালা থাকবে, মালা ভোর রাত অবধি বেঁচে থাকবে ওর হাত থেকে বিষ কেড়ে নিয়ে এসে তুমি তা কি কাজে লাগাচ্ছ জেনে যেতে। সুতরাং—' ওপাশের দেয়াল থেকে প্রতিমা স্নিগ্ধ ক্ষীণ গলায় হেসে উঠল। প্রতিমার হাসি ও কথা নীরদ শুনল। কিন্তু আশ্চর্য আর সে সেদিকে তাকাতে পারছিল না, প্রতিমার দিকে তাকাবার সাহস তার এই মুহূর্তে চলে গেছে বলে মনে হল। কেন এমন হল, কেন কেন হঠাৎ—অস্থির অপ্রসন্ন মন নিয়ে নীরদ টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে তাড়াতাড়ি খোকার বিছানার পাশে দাঁড়ায়। যেন ভয় পেয়েছে সে। যেন বিছানার ধারটা তার আশ্রয়। মশারীটা নড়ছে কি? 'না আমার চোখের ভুল।' বিড়বিড় করে উঠল নীরদ। আর সঙ্গে

সঙ্গে খোকা স্বপ্ন দেখে হাসল : 'বাবার সঙ্গে কাল চেঞ্জে চলে যাচ্ছি মালাদি, আমার বাবুর সঙ্গে।'

'বাবু!' বাবু!' আর্ত অসহায় কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে নীরদ খোকার বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ষোল

কালো ধুমসী বিড়ালটা খোকার বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ল। মশারীর একদিক তোলা আর একদিক মেঝেয় লুটোচ্ছে। কোণা ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু খোকা কই দাদাবাবু কোথায়। হরির মা ঘাড় ঘুরিয়ে নীরদের শূন্য বিছানা দেখল। টেবিল দেখল। আলনা দেখল। বাক্স দেখল। কোণায় ছাতাটা ঝুলছে। দাদাবাবুর বর্ষাতি ঝুলছে। আরো অনেক কাপড়-চোপড়। আলমারীর নীচে জুতোগুলি পড়ে আছে।

বুড়ীর কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল।

'রোগা ছেলেটাকে নিয়ে দাদাবাবু ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, নাকি রাত থাকতে উঠে চলে গেছে কোথাও!'

'খোকা, খোকন, সোনা আমার! দাদাবাবু।' যেন পাশের ঘরে আছে দু'জন। 'বাপ-বেটা ওখানে কি করছে? খোকা তো হাঁটতে পারে না, পাঁজাকোলা করে দাদাবাবু ওকে ওঘরে নিয়ে গেল কেন?'

বিড়বিড় করতে করতে বুড়ী দুটো পাল্লা ঠেলে পাশের কামরায় ঢুকল। জলের বালতি কুঁজো থালা গ্লাস উনন কয়লা ঘুঁটে—ওধারে দাদাবাবুর খাবার ছোট টেবিল, চেয়ার, চেয়ারের পিঠে শুকনো

তোয়ালে ! কিন্তু মানুষ কই। ওরা গেছে কোথায় ? বুড়ী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'মালা, মালাদি ওরা কোথায় গেল গো ?'

'কারা ?' হরির মার মুখের দিকে তাকিয়ে মালা প্রশ্ন করল, 'কাদের কথা বলছ ?'

'আমাদের ঘরের খোকা, খোকার বাবা ?'

মালার চেহারা এক রাত্রে বদলে গেছে। চোখের নিচে কালি। আলুথালু চুল। পরনের কাপড়টা বড় বেশি ময়লা। গায়ে ছেঁড়া ব্লাউজ। প্রায় লজ্জা নিবারণ হয় না এমন ছেঁড়া। অন্য সময় এবেশে মালাকে দেখলে হরির মা চমকে উঠত, দুঃখ করত, দুটো সহানুভূতির কথা বলত। কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা তা না। কেবল হাঁ করে মালার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছে।

'তা ওরা দুজন গেছে কোথায় আমি কি করে বলব। আমি তো তোমাদের ঘরে যাই নি হরির মা, রাত্তিরেও না সকালেও না। সেই তো কাল দুপুরের দিকে বাবুকে একটু দেখতে গিয়েছিলাম। আমি কিছু জানি না আমি বলতে পারব না তোমাদের ঘরের খবর।'

কেমন যেন খাপছাড়া উত্তর, নীরস গলা, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। মালার কাছ থেকে বুড়ী এমনটা আশা করে নি। হাঁ করে আর একটু সময় আপাদমস্তক মেয়েটাকে দেখে বুড়ী সিঁড়ির দিকে চলল। হাঁ করে তাকিয়ে মালাও হরির মাকে দেখছিল। মালার চোখে রং নেই আগ্রহ নেই প্রশ্ন নেই ঔৎসুক্য নেই।

কি, অন্যদিন হলে এখনি একবার পাশের ফ্ল্যাটে উঁকি দিত ও। আজ যেন দুমণ পাথর বেঁধে দিয়েছে কে তার পায়ে। ইচ্ছা করলেও সেদিকে যেতে পারবে না। তাই চুপ করে বসে বাসন

মাজতে লাগল আর ভাবতে লাগল। 'শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল নীরদ?' শব্দ করে হেসে উঠতে ইচ্ছা করল মালার। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করল। কিন্তু কিছুই করল না, বোবা শূন্য দৃষ্টি মেলে কলতলার সিমেণ্টের শ্যাওলা দেখতে লাগল। বাসন মাজতে হাত সরছিল না। এত বাসন চাপিয়ে দিয়েছে আজ রমলা তার কাঁধে!

·

লালু মাথা চুলকায়। বুড়ী চোখ মোছে।

'জিনিসপত্তর সব পড়ে আছে। এসে দেখি সদর দরজাটা খোলা।'

লালু বলল, 'তাই তো কোথায় গেলেন নীরদবাবু।'

'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?'

'ডাক্তারবাবু আজ আসবেন কি? কাল তো যাবার সময় বলে গেছেন মাথা টিপটিপ করছে। হয়তো জ্বর হয়েছে, হয়তো আজ আর আসবেনই না। বড়লোক মানুষ, একটু অসুখ করলেই বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না, বুঝলে না হরির মা।' লালু মিষ্টি করে হাসল। কিন্তু হরির মার সে হাসি ভাল লাগল না।

'তবে এখন উপায়? আর কার কাছে আমি খোঁজ নেব ওরা কোথায় গেছে!' হরির মা নিজের মনে বকতে লাগল।

লালুর তাতে কান নেই। খাঁচার ভিতর ইঁদুর দুটোর ছুটোছুটি দেখছে। একটু পর যখন চোখ তুলল দেখল বুড়ীর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে।

'আসবে হয়তো বিকেলের দিকে। কোথাও যদি বেড়াতে গিয়ে থাকে।' লালমোহন হরির মাকে সান্ত্বনা দেয়।

যেন বিশ্বাস করতে বাধছিল বুড়ীর।

'দেখতে দেখতে রোদ কতটা চড়ে গেল। ধারে কাছে কোথাও যায় নি। তা হলে তো এইবেলা ফিরে আসত।' একবার থামল বুড়ী। তারপর আবার কঁকিয়ে উঠল। 'রোগা ছেলেটাকে কি করে টেনে নিয়ে গেল গো, অ্যাঁ।'

বুড়ী দরজার কাছে সরে যেতে লালমোহনের কি একটা কথা মনে পড়ে।

'এই শোন হরির মা!'

হরির মা ঘাড় ফেরায়।

'তুমি ওপরে যাচ্ছ এখন?'

বুড়ী উত্তর দিতে পারল না।

লালু বলল, 'যদি ওপরে যাও খোঁজ নিও তো মালাদি কটা ইঁদুর মারল।

'কিসের ইঁদুর, কেন, কি বলছিস তুই?' বুড়ীর গলার ভিতর কেমন একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয়।

লালমোহন ফিক করে হাসল।

'দেখবে, দ্যাখো না গিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে একবার উঁকি দিয়ে, এমন জিনিস মালাদি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে!'

হাসিটা ভাল লাগল না, কথাগুলো ভাল লাগল না হরির মার। ডিস্পেন্সারীর দরজা পার হয়ে রাস্তায় নামল। কিন্তু কোন্‌দিকে যাবে? ডাইনে কি বাঁয়ে। চিন্তা করে বুড়ী ডাইনে হাঁটতে লাগল। তিনটে দোকানের পরে বনমালীর দোকান। নীরদের জন্য পান সিগারেট কিনতে হরির মাকে বনমালীর দোকানে রোজই দু-তিনবার আসতে হয়। সেই সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠতা।

'হ্যাঁ-রে বনমালী, আমাদের বাবুকে তো দেখছি না।'

ছেলের বয়সী বনমালীও বুড়ীকে মাসি ডাকে। বুড়ীর কথা

শুনে বনমালী একটু অবাক হল। 'সে কি কথা মাসি, তোমায় কিচ্ছু বলেনি বড়বাবু ?'

বুড়ী ততোধিক অবাক হয়ে বনমালীকে দেখে।

'আমি তো সেই সাত সকালে পেয়ারাবাগান থেকে চলে আসি। আজ এসে দেখি ঘর খালি বিছানা খালি। খোকা নেই দাদাবাবু নেই।'

বিড়ি ধরিয়ে বনমালী কি ভাবল। যেন নিজের মনে বলল, 'এতকালের একটা লোক। আপন লোকের চেয়েও ঢের বেশি করেছে—জানিয়ে গেল না। বলে গেল না !'

'তুই জানিস নাকি বনমালী, তোকে বলে গেছে দাদাবাবু কোথায় গেছে ?' বুড়ী চোখ বড় করল, ঘনঘন নিশ্বাস ফেলল।

'এই তো ভোরবেলা চলে গেল। ট্যাক্সি থামিয়ে দু প্যাকেট সিগারেট দুটো দেশলাই নিয়ে গেল।'

'কোথায় ?' বুড়ী কথা বলতে পারছিল না, যেন তার নিশ্বাস শব্দ করছিল প্রশ্ন করছিল।

'বলল, রাত থাকতে বেরোতে হয়েছে ভোরের ট্রেন ধরবে বলে।' বনমালী বলল, 'হ্যাঁ, রাত তখন তিনটে হবে। ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে সিগারেট নিয়ে গেল।'

বুড়ী আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। সেই যে মাথা নিচু করল মুখ নিচু করল আর তুলল না। হঠাৎ আঘাত পেলে মানুষের কি রকম চেহারা হয় যদি হরির মাকে তখন কেউ দেখত বুঝত। হাঁটতে পারছে না পায়ের জোর চলে গেছে। কোমরটা সোজা করতে পারছে না। বাহান্ন বছর বয়সের হরির মা আজ যেন বিরাশি বছর বয়সে চলে এল।

বাড়ির সদর পার হয়ে ঘোরানো গোল সিঁড়িটার কাছে এসে বুড়ী অসহায় চোখে ওপরের দিকে তাকাল।

বুকের ব্যথাটা ডেলা পাকিয়ে এতক্ষণ শক্ত হয়ে ছিল। এবার গলতে আরম্ভ করল।

'খোকন, আমার সোনা।' ভাবতে গিয়ে এত বছর পর হরির মার মনে হল : না, যতই সে ওদের আপন করে দেখুক, ওরা দেখেনি দেখতে পারে নি। ঝি দাসী। হরির মার সঙ্গে এর বেশি আমাদের সম্পর্ক নেই। তাই—তাই—

অনেক কষ্টে সিঁড়িগুলো ভেঙে বুড়ী দোতলার প্যাসেজে এসে দাঁড়াল। 'তাই তো খোকা পাহাড়ের কথা বলত সমুদ্দুরের কথা বলত। এ্যাঁ, যাবার সময় তুই একবার বললিনে, বাবা মাসিকে বলে যাও। সকাল হোক—মাসি এলে ঘর দরজা ওর হাতে বুঝিয়ে দিয়ে তবে আমরা রওনা হব। নাকি খোকন খুব কাঁদাকাটা করেছিল এভাবে যেতে!' হতবুদ্ধি হয়ে একলা প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বুড়ী ভাবতে লাগল। তারপর এক-পা এক-পা করে আবার মালার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ডাকল, 'মালা!' 'মালা!' উত্তর নেই। যেন যমপুরীর মতো নীরব হয়ে আছে এদিকের ঘর-দরজা।

'না না, আমি বলছি ওরা ঘরের চাবি কার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। এভাবে জিনিস-পত্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে কেউ এত বেলায় বাইরে থাকে!'

চিৎকার শুনে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। কাঁদছিল ও, না ঘুমোচ্ছিল?

'তুমি আবার আমায় বিরক্ত করতে এসেছ। তোমার নীরদবাবু কি আমায় যাবার সময় বলে গেছেন যে আমি এসব কথার উত্তর দেব?'

বুড়ী চুপ করে রইল।

'তোমার চেয়ে আমি সুখী না হরির মা। এক কাড়ি বাসন

মেজে আমার গা-পিঠ ব্যথা করছে। এখনি আবার বাচ্চা জাগবে। বাচ্চা আগলাতে হবে। তুমি কি জান না—যাও, তোমার পায়ে ধরি, আমায় বিরক্ত করো না, আমায় একটু ঘুমোতে দাও, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও—যাও—সরো—'

রুক্ষ বিকৃত কণ্ঠস্বর। যেন প্রকৃতস্থ নয় মালা। যেন তার কি একটা কঠিন অসুখ করেছে। অন্য সময় হলে হরির মা মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করত।

'যাও—সরো'— স্বরটা এত বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে বুড়ীর বুকে এসে বিঁধল যে আর এক মুহূর্ত তার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। আস্তে আস্তে চলে এল ঘরে—নীরদের শূন্য ঘরে। শূন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী করবে এখন ও। উনন ধরাবে ? বাসন ধোবে ? জল তুলবে ? বাটনা বাটবে ? কিন্তু কার জন্য কিসের জন্য। কারা খাবে ? বুড়ী খোকার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। মশারীর কোণাগুলো ছাড়িয়ে সেটা গুটিয়ে রাখল। রংচং-এ ছবির বইটা বিছানার এক পাশে খোলা পড়ে আছে সেটা বন্ধ করে শিয়রের ধারে রেখে দিল। তারপর ? একটা বড় হাই তুলল হরির মা। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। সিমেন্টের ওপর বসে পড়ল। ওধারের দেয়ালে একটা কেমন ফর্‌র্‌ শব্দ শুনে বুড়ী চমকে সেদিকে চোখ ফেরাল। অন্য সময় হলে বুড়ী টিকটিকিটাকে তাড়া করে মুখের আরশোলাটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। খিলখিল করে হাসত খোকা। টিকটিকির মুখ থেকে আরশোলাটাকে বাঁচাতে হেই হুই শব্দ করে মাসির লাফালাফি আর দেয়ালে কিল মেরে থাবা মেরে কি ঝাড়ন তুলে টিকটিকি তাড়াতে দেখলেই খোকা বলত : 'ওটা ওর খাদ্য মাসি। ওর জিনিস ও খাবে না ?' শুনে বুড়ী বলত : 'তা হলেও তো বাবা চোখের ওপর এমন একটা অন্যায় দেখা যায়

না, সওয়া যায় না। তোর গায়ে জোর আছে বলে তুই ওর ঘাড় কামড়ে ধরবি। যা এখান থেকে—যাঃ যাঃ—পাপ!' আজ বুড়ী সে-সব কিছুই বলল না। উঠল না নড়ল না। কেবল হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে আরশোলার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখল। এক সময় ছটফটানিও থামল। ছুটো পাখা নিচে ঝরে পড়ল, মুণ্ডটা আর ছু ফোঁটা রক্ত।

কটা বাজে এখন? বুড়ী জানালার দিকে ঘাড় ফেরায়। অন্য দিন খোকার শিয়রের দিকের জানালার গরাদের ছায়াগুলো দেখে ও বলতে পেরেছে নটা, সাড়ে ন, সাড়ে দশ, বারোটা, একটা। আজ গরাদের ছায়া দেখে বেলা আন্দাজ করার শক্তি তার লোপ পেয়েছে। সেই বোধ নেই। একটু একটু ঘুম পাচ্ছিল। পেটের ভিতরটা একেবারে খালি আছে বলে একটা কলকল শব্দ শুনল বুড়ী। শব্দ শুনে চমকে উঠল। এতটা বেলা হল, এক ফোঁটা চা গিলতে পারে নি, গেলার সময় হয়নি এবং মনেও ছিল না, এখন তার মনে পড়ল। দেড়টা বাজে? না না, দেড়টা কেন, ছুটো বাজবে। বেলা ছুটো থেকে আড়াইটের ওপর হরির মার বড় বেশি কড়া নজর। আজ সব বোধ তার চলে গেছে, অন্য সব কিছুর সময়ের চিহ্ন রং গন্ধ মন থেকে মুছে গেছে, কিন্তু বেলা ছুটোর সময় খোকার ছুধ গরম করে দেওয়ার কথাটা ঠিক মনে আছে। 'খোকা, খোকন রে—সোনা আমার।' বলতে বলতে বুড়ী উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তার পা কাঁপতে লাগল, মাথাটাও কেমন ঘুরছিল। জিভটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ঢোক গিলতে গিয়ে ঢোক গিলতে পারল না। বড় তেষ্টা পেয়েছে। তাই, একটু জল খাই একটু জল তো আগে গিলে নিই। মনে করে বুড়ী টেবিলের কাছে গিয়ে কেমন মতিচ্ছন্নের মতো খোকার ছুধ খাওয়ার, হরলিকস্ খাওয়ার গ্লাসটা হাতে তুলে নিল, তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে রান্না ঘরের দিকে চলল।

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বুড়ী ঢক ঢক করে প্রায় সবটা গিলে ফেলল। কিন্তু গেলার পর তার মনে হল জলের কোনো স্বাদ ছিল না, বরং যেন কেমন বিস্বাদই ঠেকেছে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী একটা ওয়াক তুলল। কিন্তু পেটের জল আর উঠে এল না। বুড়ী ভয় পেল। পেটটা জ্বলছে। কাঁচের গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে রেখেছিল। কি মনে করে হাত বাড়িয়ে সেটা নাকের কাছে তুলতে গেছে যখন তখন তার হৃদপিণ্ড প্রচণ্ড শব্দ করে ওপর দিকে ধাক্কা দিল। কাঁচের গ্লাস হাত থেকে ছিটকে পড়ে মেঝের ওপর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইল। সে-সব দেখবার শক্তি ছিল না হরির মার। তার চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। 'হরি—হরি—' আর খোকন না দাদাবাবু না, ভয় পেয়ে নিজের ছেলেকে ডাকতে চাইল বুড়ী—পারল না। গলা দিয়ে শব্দ বেরল না। কেবল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। আর ঠিক সেই সময় ঠোঁটের পাশে দেখা দিয়েছে রক্ত। সিমেণ্টের ওপর ছড়ানো কাচের ভাঙা টুকরোর ওপর বুড়ীর শরীর ঢলে পড়ল।

আষাঢ়ের বেলা। যাই যাই করে কি আর যায়? ছটা বেজে গেছে। তখন রোদের ঝিকিমিকি লেগে আছে গাছের মাথায়-রাস্তার পাশের আলোর থামের গায়ে। মারাঠা ডিচের কাছে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। ব্রিজের ওপর উঠতে পারছে না, ট্রাফিকের চাপে রাস্তা বন্ধ। ট্যাক্সির পিছনের সীটে মাণিক আর মালা বসে আছে। আস্তে আস্তে কথা বলছিল দুজন।

'সত্যি আজ এক কথায় তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে আমি ভাবতে পারি নি।'

'সত্যি করে চেয়েছ বলেই এলাম।' মালা এতক্ষণ গম্ভীর ছিল এখন ক্ষীণ গলায় হাসল। 'চাওয়া সত্যিকারের হলে পাওয়া সহজ হয় তুমি কি জান না।'

মাণিক হাসল।

'তাই তাই, না হলে কাল তোমার দাদা বৌদি যেমন কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল—অবশ্য গায়ে মাখিনি আমি সেসব, কেননা এখানে ওরা দুজন তো কিছু নয়—এখানে তুমি আর আমি—কাজেই—' একটু থেমে মাণিক বলল, 'বলছ প্রফুল্লবাবু পরে মত পাল্টে তোমায় নিয়ে আসতে আজ আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু সে চিঠি তো আমি পাইনি—তার আগেই আমি আজ আবার ছুটে গেছি তোমাদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায়। সত্যি কী ভীষণ ছটফট করছিল বুকের ভেতরটা আজ কদিন ধরে! আমি অনুতপ্ত মালা, আমি যে কত অনুতপ্ত!' আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মাণিক মালার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

'আস্তে—আস্তে!' হাত ছাড়াল না মালা, চোখের ইশারায় ট্যাক্সি চালককে দেখিয়ে বলল, 'শুনতে পাবে।' তারপর মালা এক সময় বলল, 'অনুতাপ করা ভাল, অনুতাপ করলে মানুষের সব পাপ মুছে যায়।' বলে ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে গেল। আর মাণিক চোখের পলক না ফেলে মালার ঘাড়ের এবং সুন্দর বাঁকা ভুরুর রেখা দেখতে লাগল।

আর তখন উত্তর প্রদেশের এক উর্বর প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে তুফান এক্সপ্রেস। একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় নীরদ ছেলেকে নিয়ে বসে আছে। গদি-আঁটা প্রশস্ত বেঞ্চির ওপর বিছানা করে বাবুকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবু

এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, এখন চোখ মেলে বাবাকে দেখছে। ক্লান্ত বিমর্ষ নীরদ জানালার ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে দুবার ঘুমোবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এখন সোজা হয়ে বসেছে। 'বাবু!' ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে নীরদ হাসতে চেষ্টা করল।

'এবার কি মির্জাপুর স্টেশনে ট্রেন ধরবে বাবা।'

'আর একটু পরে।' কোলের ওপর টাইমটেবলটার গায়ে হাত বুলিয়ে নীরদ বলল, 'এখন আমরা—'

নীরদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাবু প্রশ্ন করল, 'পাহাড় দেখা যাচ্ছে বাবা?'

'হ্যাঁ, ঐ তো পাহাড়।' জানালার বাইরে দিগন্তের নীলাভ বন্ধুর রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে নীরদ বলল, 'আমরা তো পাহাড়েই যাচ্ছি, কত সুন্দর কত বড় বড় পাহাড় দেখবে তুমি।'

শুনে বাবুর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। নিষ্প্রভ কোমল চোখ দুটো উত্তেজনায় আনন্দে একটু চকচক করে উঠল। আর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে নীরদ কি যেন ভাবল, তারপর নুয়ে খোকার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তোকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, কেমন রে খোকা?'

চোখ বুজে খোকা মাথা নাড়ল। তারপর চোখ খুলে বাবাকে দেখল। তারপর কি একটু ভেবে পরে এক সময় আস্তে আস্তে বলল, 'মাসিও আমায় খুব ভালবাসে, না বাবা?'

নীরদ মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, হরির মা—'

'মাসিকে কিন্তু বলে আসা হয়নি বাবা, হয়তো আমাদের জন্য ও খুব ভাবছে।'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে তো আগে পৌঁছুই। তারপর

সেখান থেকে হরির মাকে একটা চিঠি লিখে জানালেই হবে। তার জন্য চিন্তা কি।' নীরদ পকেট থেকে সিগারেট বার করল।

কথা শেষ করে নীরদ যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল, ঠিক তখন আমহার্স্ট স্ট্রীটের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার মতন বাড়ির দরজার সামনে পুলিশের কালো গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে।

নীরদের রান্নাঘরের মেঝেয় হরির মার ঠাণ্ডা শক্ত শরীরটা আবিষ্কার করে নিচের ডিস্পেন্সারীর লালু—লালমোহন। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে মালাদি ইঁদুর মেরে রেখে গেছে দেখতে বুঝি চুপিচুপি ও ওপরে এসেছিল। এদিকের ফ্ল্যাটে কিছু না দেখে সে ওদিকের ফ্ল্যাটে—নীরদের ঘরে উঁকি দিয়েছিল। হরির মা এভাবে মরে পড়ে আছে দেখে ভয়ে লালু চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে রমলা। একটু আগে মাণিক এসেছিল মালাকে নিয়ে যেতে। দুজনকে জলখাবার খাইয়ে বিদায় করে দিয়ে হৃষ্টমনে বসে রমলা ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। এমন সময় লালুর চিৎকার তার কানে যায়। সিমেন্টের ওপর ছড়ানো ভাঙা কাঁচের ওপর বুড়ীকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে রমলাও আর্তনাদ করে উঠেছিল। তারপর বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি সে নিচে নেমে যায়। মোড়ের সেই লোহালক্কড়ের দোকানে উঠে রমলা ফোন করে প্রফুল্লর বৌবাজারের দোকানে খবর পাঠায়। প্রফুল্লর দোকানে টেলিফোন নেই। তাহলেও আপদে বিপদে যদি কখনও ডাকতে হয় এইজন্য প্রফুল্ল বহুদিন আগে পাশের দোকানের একটা ফোনের নম্বর রমলাকে দিয়ে রেখেছিল। রমলার ফোন পেয়ে প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে আসে। প্রফুল্ল

আসতে আসতে নীরদের ফ্ল্যাটের দরজায় ভিড় জমে যায়। রাস্তার দু একজন লোকও কৌতূহলবশতঃ ওপরে উঠে আসে। নীরদ ও তার ছেলে সেই সকাল থেকে বাড়িতে নেই, এদিকে তার ঝিয়ের এই অবস্থা। পাড়ার দু চারজন মাতব্বর গোছের লোক প্রফুল্লকে তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দিতে পরামর্শ দিল। প্রফুল্ল তাই করল।



